অষ্টম সংস্করণ



তখন আমি সব ভুলে আপনহারা হোয়ে যাই (৯১ পৃঃ)

পাবণ্ডক

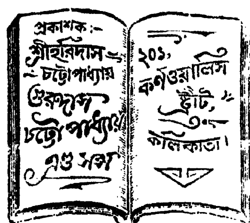
(গল্পগ্রন্থ)

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

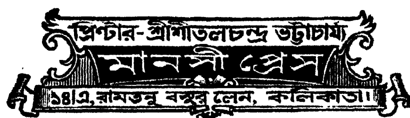
প্রণীত

১৩২৯

মূল্য ১॥০


প্রকাশক :—
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।


& SONS


প্রিণ্টার-শ্রীশীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য
মানসী প্রেস
১৪।এ, রামতনু বসুর লেন, কলিকাতা।

আত্মকথা

পাঁচটি ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা সন্নিবেশিত হইয়াছে, এজন্য পুস্তকের নাম পঞ্চক হইল। আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে প্রথম দুইটি ১৩২৬ সালে আশ্বিন ও ফাল্গুন মাসের 'মানসী ও মর্ম্মবাণী' মাসিক পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল; তৃতীয় ও চতুর্থ গল্প দুইটিও ঐ পত্রিকাতেই ১৩২৭ সালে শ্রাবণ ও কার্ত্তিক মাসে প্রকাশিত হয়। "বারুণী" নামক পঞ্চম গল্পটি ১৩১৭ সালে বৈশাখ মাসে 'সাহিত্য-সংহিতা' নামক মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছিল। বারুণী গল্পটির শেষাংশের কিছু পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে; মূল গল্প অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, কেবল লিখন-পদ্ধতিই পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

কাণপুর বালিকাবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সুপ্রভা ঘোষ 'ভ্রান্তির পরিণাম' গল্পটি হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন। পরে ১৯ সালের জুন ও জুলাই সংখ্যায় ঐ অনুবাদ এলাহাবাদের 'স্ত্রীদর্পণ' নামক হিন্দী মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

আশ্রম, হুগলি;
১লা বৈশাখ, ১৩২৯ } শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়

সূচী

পঙ্ক



কুলীন-কুমারী

প্রথম পরিচ্ছেদ

মূর্চ্ছা

রতনপুর বর্দ্ধমান জেলায়,—মেমারী রেল ষ্টেশনের প্রায় তিন ক্রোশ উত্তরে। রতনপুর হইতে মেমারী আসিতে হইলে, প্রথমে দুই ক্রোশ ব্যাপী ধান্যক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া, চৌগ্রাম নামক এক বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে আসিতে হয়; তাহার পর, চৌগ্রাম হইতে পুনরায় ক্রোশব্যাপী ধান্যক্ষেত্র পার হইয়া মেমারী রেল ষ্টেশনে পৌছিতে পারা যায়। রতনপুর হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত 'মাঠাল' রাস্তা বা আইল পথ; তাহা অসমান, বৃক্ষাদির ছায়া-বর্জ্জিত, এবং তজ্জন্য দুরধিগম্য। কিন্তু চৌগ্রাম হইতে যে রাস্তা মেমারী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, তাহা পাকা প্রশস্ত রাজপথ; তাহার দুই পার্শ্বের বৃহৎ বৃক্ষ

সকল পথক্লান্ত পথিকগণের মস্তকে শীতল ছায়া বর্ষণ করিত; বৃক্ষাশ্রিত পক্ষিগণ তাহাদের কর্ণে সুধার ধারা ঢালিয়া দিত।

রতনপুর নিবাসী হারাধন মুখোপাধ্যায় কলিকাতা অভিমুখী গাড়ী পাইবার প্রত্যাশায়, স্বগ্রাম হইতে মেমারী যাইতেছিলেন। তাঁহার সহিত তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া গীতা নাম্নী কন্যা ছিল।

চৈত্র মাস। দ্বিপ্রহরের প্রখর ও পরিশুষ্ক রৌদ্রে, চৌগ্রামের নিকটে আসিয়া বৃদ্ধ হারাধন অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন।

হারাধন অতি উচ্চদরের কুলীন ব্রাহ্মণ,—কৌলিন্যের গৌরবে মহা গৌরবান্বিত। সেরূপ উচ্চদরের কুলীন হইলে, বাল্যকাল হইতেই বহুবিবাহ করা আবশ্যক; কিন্তু হারাধন, সুবুদ্ধি কুলীনের ন্যায়, এই আবশ্যক কার্য্যটি করেন নাই; তিনি বাল্যকালেও বিবাহ করেন নাই, এবং বহুবিবাহ করেন নাই। তিনি চল্লিশ বৎসর বয়সে বিবাহ করিয়াছিলেন; এবং একটিমাত্র পত্নীতেই পরিতুষ্ট ছিলেন। কুলীনের অত্যাবশ্যক কার্য্য না করিলেও, তাঁহার পক্ষে যাহা অত্যন্ত অনাবশ্যক, তাঁহার অদৃষ্টে তাহা ঘটিয়াছিল;—তিনি কন্যার জনক হইয়াছিলেন। তিনি এই কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন গীতা।

কেহ চিরদিন শিশু থাকে না। গীতা বিধাতার ইচ্ছায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত গীতার রূপের জ্যোতি প্রস্ফুট হইয়া উঠিল। তাহার সৌন্দর্য্যখ্যাতি নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলে প্রচারিত হইয়া পড়িল; সকলেই বলিল, এমন মেয়ে সাতখানা গ্রাম খুঁজিলেও পাওয়া যায় না।

শুনিয়া ... র্ত্তীরা গীতাকে পুত্রবধূ রূপে গ্রহণ করিবার জন্য ... ন, তাঁহারা হারাধনের নিকট লোক পাঠাইয়াছি... াহাদের প্রস্তাব শুনিয়া হারাধন প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের ... উঠিয়াছিলেন—কি! এতবড় স্পর্দ্ধা! চক্রবর্ত্তী ব্রা... ীন-কুমারীকে পুত্রবধূরূপে পাইবার প্রত্যাশা! হউক ... মীদার, হউক না তাহারা বিদ্বান! জমীদারীর গৌর... ব, কৌলিন্যের গৌরবের অনেক নিম্নে।—সুতরাং ... ধনী জমীদারদিগের বাটীতে গীতার বিবাহ হইল না।

তথাপি এই কুলীন-কুমারী বিব ... ছিল। বিবাহ-যোগ্যা কন্যা অনূঢ়া থাকায় হারাধ... বাসিনীগণের নিকট নিন্দিতা হইতেন। নিশীথে, ... দ্র কর্ণে সে নিন্দা প্রতিধ্বনিত হইত। হারাধন কন্যা... স্ত হইয়া পড়িলেন। কন্যা অত্যন্ত সুন্দরী হইলেও ... কুলীন পাত্র ব্যতীত তাহাকে অন্য পাত্রে সমর্পণ করা ... । কুলীন পাত্র দুর্ম্মূল্য সামগ্রী; দরিদ্র পল্লীবাসী হারাধন ... কিরূপে ক্রয় করিবেন?

কুলীন পাত্রানুসন্ধানের জন্য হারাধন আত্মীয়স্বজনগণকে পত্র লিখিলেন। তিনি তাঁহার শ্যালক শ্রীযুক্ত রত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের নিকট হইতে এই পত্রোত্তর পাইলেন। রত্নেশ্বর হাওড়ায় নিকট-বর্ত্তী শিবপুরে বাস করিতেন, এবং হাওড়ার আদালতে মোক্তারি করিতেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে তিনি বহুকষ্টে এক কুলীন

কুমারের সন্ধান পাইয়াছেন। কুলীনকুমার মাতুলালয়ে প্রতিপালিত, অল্প ব্যয়ে তাহাকে ল ...ত পারে। কিন্তু বরপক্ষ কলিকাতাবাসী; তাঁহারা ...েখিবার জন্য পল্লীগ্রামে যাইবার কষ্ট স্বীকার করি... ন; সুতরাং কন্যাকে শিবপুরে লইয়া আসিতে হইবে

ঐ পত্র পাইয়া, কন্যাকে লইয়া ...বপুরে যাইতেছিলেন। স্থির করিয়াছিলেন যে ...ত মেমারী পদব্রজেই যাইবেন; পল্লীবাসীদিগের ...ক্রোশ পথ ভ্রমণ করা কষ্টকর নহে। কিন্তু হারাধন ...র রৌদ্রের কথা এবং নিজের পরিণত বয়সের ...রিয়া দেখেন নাই। চৌগ্রামের নিকট আসিয়া তিনি ...পড়িলেন। চাহিয়া দেখিলেন, নিকটে কোন স্থানে ...য় বৃক্ষ নাই; চারিদিকে চৈত্রের শস্যশূন্য মাঠ, মূ...রের ন্যায় বিদীর্ণ বক্ষ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; নির্দ...র্দ্দয় চিকিৎসকের ন্যায় মাঠের সেই বিদীর্ণ বক্ষে অগ্নি... প্রলেপ লেপিয়া দিতেছে; বায়ুবিকারগ্রস্ত রোগীর দীর্ঘ... প্রবাহিত হইতেছে।

বৃদ্ধ পিতার কাতরতা দেখিয়া গীতা কাপড়ের ছোট গাঁটরীটি পিতার হস্ত হইতে আপনার কক্ষে ধারণ করিল এবং পিতাকে সাহস দিয়া কহিল, "আর একটুখানি বাবা! আর একটুখানি পরেই আমরা গ্রামে প্রবেশ করব। তখন কোনও গাছতলায় বসে' কিম্বা কোন দোকানে বসে তুমি জিরিয়ে নিতে পারবে। সমুখে ঐ গ্রামের নাম কি বাবা?"

বৃদ্ধ কাতরকণ্ঠে বলিলেন, "চৌগাঁ।"

বালিকা পূর্ব্বে কখনও রতনপুরের বাহিরে আসে নাই! সে মনে করে নাই যে মেমারী যাইতে হইলে রাস্তায় চৌগ্রাম দেখিবে। পিতার নিকট চৌগ্রামের নাম শুনিয়া, চৌগ্রামের জমীদারের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল ; ছয় মাস আগে বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া জমীদারের লোক তাহাদের বাটীতে আসিয়াছিল। সেই বিবাহ হইলে, আজ তাহার পিতার এত কষ্ট হইত না। মনের কথা মনে রাখিয়া, সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, চৌগাঁয়ে জল-খাবারের দোকান আছে?"

বৃদ্ধ কহিলেন, "হ্যাঁ, গ্রামে ঢুকেই আমরা একখানা জল-খাবারের দোকান পাব। সেখানে পৌঁছতে পারলে হয়, একবার মনের সাধে জল খাব ;—তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। ঐ বটগাছটা দেখছ, ঐ গাছটার কাছ পৌঁছতে পারলেই আমরা গ্রাম পাব।"

আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া বালিকা কহিল, "ঐ দেখ বাবা, ঐ কাদের মস্ত কোঠা দেখা যচ্ছে।"

বৃদ্ধ কহিলেন, "ঐ জমীদারদের বাড়ী।"

কিয়ৎকাল মধ্যে, হারাধন পূর্ব্বকথিত বটবৃক্ষের তলে উপনীত হইলেন। গীতা কক্ষ হইতে গাঁটরিটী নামাইয়া পিতাকে বলিল, "বাবা, তুমি এই বটগাছের ছায়ায় এই শিকড়ে ঠেস দিয়া এই পুটুলির উপর বস, আমি তোমার জন্যে ঐ পুকুর থেকে একটু জল নিয়ে আসি।"

বৃদ্ধ, কন্যার নির্দ্দেশ মত বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন।

নিকটে পুষ্করণীর একটা বাঁধা ঘাট দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। গীতা জল আনিবার পাত্রের জন্য মানগাছের একটা পাতা ছিঁড়িয়া লইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেল। কিন্তু পুষ্করিণীর ঘাটে আসিয়া দেখিল যে উহাতে একবিন্দু জল নাই, তলার বড় বড় ঘাস জন্মিয়াছে। দেখিয়া সেই পুষ্করিণীর তলার ন্যায়, তাহার হৃদয়ও শুষ্ক হইয়া গেল। সে ম্লানমুখে পিতার নিকট ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, বৃদ্ধ সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়াছেন; তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষুর তারা দুইটী সম্পূর্ণ স্থির হইয়া গিয়াছে; তাঁহার মুখবিবর হইতে ফেন নির্গত হইতেছে।

ভীতা বালিকা উচ্চস্বরে কাঁদিয়া উঠিল; কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিল, "বাবা! বাবা গো!" পিতার অবনত মস্তক দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া ডাকিল—"বাবা, বাবা গো!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৃতজ্ঞতা

চৌগ্রামের চক্রবর্ত্তীরা চৌগ্রাম এবং চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী চারি পাঁচখানা গ্রামের জমীদার।

বর্ত্তমান জমীদার বাবুর নাম শ্রীযুক্ত রাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। রাখাল বাবু কেবল মাত্র জমীদার ছিলেন না, তিনি বর্দ্ধমান আদালতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকীল। তিনি ওকালতীতে প্রচুর

অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিলেন; এবং অর্জ্জিত অর্থে বীরভূম জেলায় এক বিস্তীর্ণ জমীদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। রাখাল বাবুর জমীদারীর বাৎসরিক আয় ষাট হাজার টাকার কম হইবে না। ইহা ছাড়া, ওকালতীতেও তিনি বৎসর বৎসর পনর কুড়ি হাজার টাকা পাইতেন। সুতরাং চৌগ্রাম অঞ্চলে রাখাল বাবু বড় ভারি বাবু। চৌগ্রামে, মেমারী যাইবার রাস্তার ধারে তাঁহার নূতন বাসভবন ও তৎসংলগ্ন পুষ্পবাটিকা, পথচারী পথিকগণকে নয়নানন্দ প্রদান করিত;—তাহারা অবাক হইয়া তাহা দেখিত। রাখালবাবুর অশ্বশালার অশ্বগণ সুন্দর যানে সংযোজিত হইয়া, পদশব্দে রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিত; পল্লীপথিকগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাহা অবলোকন করিত, সে শব্দে তাহাদের হৃদয় আন্দোলিত হইয়া উঠিত।

রাখাল বাবুর এক পুত্র, তাহার নাম যুগলকিশোর। তাহার বয়স বাইশ বৎসর। সে বি-এস-সি পাস করিয়া শিবপুরে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িতেছিল। সম্প্রতি আই-ই পরীক্ষার পর ছুটী পাইয়া বাটী আসিয়াছিল। এবার বাটী আসিবার সময় সে কলিকাতা হইতে একটি ভাল দূরবীক্ষণ যন্ত্র কিনিয়া আনিয়াছিল।

বহির্ব্বাটীর ত্রিতলে একটী বৃহৎ ঘর যুগলকিশোরের পাঠাগার।

আজ আহারাদির পর পাঠাগারে বসিয়া দূরবীক্ষণ লইয়া যুগলকিশোর গবাক্ষপথে দূরস্থ বস্তু সকল নিরীক্ষণ করিতেছিল।

সহসা গ্রামের বাহিরে শস্যক্ষেত্রে তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, দুইটি ক্লান্ত পথিক আইল পথ দিয়া ধীরে ধীরে তাহাদের গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতেছে। দেখিল, পথিক দুইজনের মধ্যে একজন বৃদ্ধ ও একজন বালিকা। দেখিল, বৃদ্ধের মস্তকের উপর একটি জীর্ণ ছত্র এবং বালিকার মস্তকে একখানি ভাঁজকরা গামছা রহিয়াছে। দেখিল, বালিকার নাকে একটা নোলক দুলিতেছে। দেখিল বৃদ্ধের হস্ত হইতে একটা গাঁটরী লইয়া বালিকা আপন কক্ষে ধারণ করিল। দেখিল, উভয়ে মিলিয়া বৃক্ষতলে আসিল; বৃদ্ধ বসিল; কিন্তু বালিকা বসিল না। বালিকা একটা মানপাতা ছিঁড়িয়া লইয়া কোথায় যায়? ঐ পুষ্করিণীতে? কেন? তৃষ্ণা নিবারণ জন্য জল আনিতে? হাঁ হাঁ—যুগলকিশোর জানিত যে পাত্রাভাবে অনেক দরিদ্র ব্যক্তি মান পাতায় বা পদ্ম পাতায় জল বহন করে। হঠাৎ যুগলকিশোরের মনে পড়িয়া গেল যে ঐ পুষ্করিণীতে একবিন্দু জল নাই। সর্ব্বনাশ! এই তৃষ্ণাতুরেরা কি পান করিবে? যুগলকিশোরের করুণ হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল।

পার্শ্বের বারান্দায়, শ্বেতপ্রস্তরের মেঝের উপর শুইয়া, খস্‌খসের পর্দ্দার পার্শ্বে যুগলকিশোরের ভৃত্য ঘুমাইতেছিল। তাহার নাম গোপী।

যুগলকিশোর ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ডাকিল, "গোপী, ও গোপী।"

গোপী চোখ মুছিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলছেন?"

যুগল। তুমি এই জানালা থেকে উত্তর দিকে ঐ মাঠ দেখছ?

গোপী। হ্যাঁ, অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে।

যুগল। ঐ মাঠ থেকে গ্রামে প্রবেশ করবার পথে একটা বটগাছ দেখছ?

গোপী। কোনটা বটগাছ, এখান থেকে চিনতে পারছিনে; কিন্তু আমি জানি ঐখানে একটা বটগাছ আছে।

যুগল। ঐ বটগাছের তলায় একটি মেয়েকে, আর একজন বুড়োকে দেখতে পাবে। তারা এখনই মাঠ থেকে ঐ বটের ছায়ায় এসে বসেছে। তারা অত্যন্ত ক্লান্ত, তৃষ্ণায় বড় ব্যাকুল হয়েছে। বুড়ো জল না পেলে হয়ত মরে' যাবে। তুমি একজন মালীকে সঙ্গে নিয়ে এক কলসী ঠাণ্ডা জল, ঘটী, একখানা মাদুর আর একখানা পাখা নিয়ে এখনই ঐ বটতলায় যাও। জল খেয়ে বিশ্রাম করে' ওরা সুস্থ হলে, তোমরা ফিরে আসবে। বুড়োকে বেশী অসুস্থ দেখলে, মালীকে সেখানে রেখে তুমি একলা এসে আমাকে খবর দেবে। তার পর যা ব্যবস্থা করতে হয়, আমি করব।

গোপী ভাবিল, তাহারা যে ঐ গাছতলায় আসিয়া বসিয়াছে, এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়াছে, তাহা খোকাবাবু ঘরের মধ্যে বসিয়া কিরূপে জানিতে পারিল? যুগলকিশোরকে বাটীর সকল লোকে খোকাবাবু বলিত; বাহিরের লোকের নিকটও সে খোকাবাবু নামেই পরিচিত ছিল। খোকাবাবুর কথায় গোপীর বিলক্ষণ

অবিশ্বাস জন্মিলেও সে তাহার আদেশ অমান্য করিতে সাহস করিল না।—সে জানিত যে বরং কর্ত্তাবাবুর আদেশ লঙ্ঘন করা চলে, তথাপি খোকাবাবুর এতটুকু আজ্ঞা অপ্রতিপালিত থাকিতে পারে না।

মালীকে লইয়া, এবং আদেশ মত দ্রব্য সকল লইয়া, গোপী যখন বটবৃক্ষতলে আসিয়া হারাধন ও গীতাকে অবলোকন করিল, তখন তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না; ভাবিল, খোকাবাবু নিশ্চয়ই দৈববিদ্যা অভ্যাস করিয়াছেন।

মালী ও গোপী উভয়ে মিলিয়া হারাধনকে মাদুরে শয়ন করাইয়া, তাঁহার সেবা আরম্ভ করিল। পাখার বাতাসে ও শীতল জলসিঞ্চনে বৃদ্ধ জ্ঞানলাভ করিলেন, এবং অল্প জলপান করিয়া উঠিয়া বসিলেন। পিতাকে সুস্থ দেখিয়া, গীতা পরে জলপান করিল; এবং পিতাকে কহিল, "বাবা! আর আমাদের মেমারী যাওয়ার দরকার নেই। চল, বাড়ী ফিরে যাই। সেখানে আমি চিরকাল আইবুড় থেকে তোমাদের সেবা করব।"

হারাধন বলিলেন, "এখন আমি বেশ সুস্থ হয়েছি; আর, মেমারী যাবার রাস্তা ভাল। বেলাও পড়ে' এসেছে; গাছের ছায়ায় ছায়ায়, এই এক ক্রোশ পথ অনায়াসে যেতে পারব। মেমারী যাওয়ার চেয়ে বাড়ী ফেরা বেশী শক্ত। দু ক্রোশ রাস্তা চলতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে; আলো নেই, লাঠি নেই—এই বসন্তকালে সাপের ভয় বড়ই বেশী।"

পিতার কথা যে যুক্তিযুক্ত, তাহা গীতা বুঝিল; অতএব সে আর আপত্তি করিল না।

মাদুর, জলপাত্র ও পানপাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হারাধন গোপীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এসব কোথা থেকে এল? তোমরাই বা কি করে' জানতে পারলে, যে আমি এখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে রয়েছি?"

গোপী বলিল, "আমরা খোকাবাবুর হুকুম মত এখানে এসেছি। আপনার মূর্চ্ছা যাওয়ার কথা তিনি কেমন করে' জানতে পারলেন, তা আমরা বলতে পারি নে।"

হারাধন। খোকাবাবু কে?

গোপী। জমীদার বাবুর ছেলে।

হারাধন। কে? রাখাল বাবুর ছেলে?

গোপী। হ্যাঁ, তিনিই।

হারাধন। এই ছেলের সঙ্গেই ত আমার এই মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে রাখালবাবু চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু আমরা কুলীন, আমরা ত বংশজের ঘরে মেয়ে দিতে পারি নে। কাযেই বিয়ে হল না। খোকাবাবুকে বোলো যে তিনি আজ আমাদের জীবনরাক্ষা করেছেন, আমি কায়মনোবাক্যে তাঁকে আশীর্ব্বাদ করছি।"

পিতার কথা শুনিয়া গীতা ভাবিল, এই বংশজের পুত্রই করুণাময়, তাহার পিতার জীবনরক্ষাকর্ত্তা; তাহার নিকট সে চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকিবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নোলকের আন্দোলন

পাঠাগারে বসিয়া, দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে যুগোলকিশোর দেখিল যে তাহার আদেশ মত গোপী একজন মালীকে লইয়া, বৃদ্ধের সেবা করিতেছে। দেখিল, সেবায় সুস্থ হইয়া বৃদ্ধ উঠিয়া বসিলেন। দেখিল, বৃদ্ধকে সুস্থ দেখিয়া বালিকা পরে জলপান করিল; ভাবিল, এই কন্যা পিতৃপরায়ণা বটে, বৃদ্ধের অসুস্থাবস্থায় জলপানে তাহার প্রবৃত্তি হয় নাই। তাহার পর, যুগলকিশোর আবার দেখিল যে বৃদ্ধ উঠিয়া গ্রাম মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার পর, আর তাহাদিগকে আর দেখা গেল না,—গ্রামের বৃক্ষান্তরালে তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল।

যুগলকিশোর দ্বিতলে নামিয়া আসিল। দ্বিতলের এক কক্ষের গবাক্ষ হইতে, তাহাদের বাটীর সম্মুখের রাস্তা বেশ দেখা যায়, এবং পথিকগণের কথাবার্ত্তাও বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। সে বুঝিয়াছিল যে বৃদ্ধ ও বালিকা ঐ পথ দিয়াই যাইবে। সে স্থির করিয়াছিল যে নোলকপরা বালিকাটিকে সে ভাল করিয়া দেখিবে। পথগামিনী এক অপরিচিতা বালিকাকে দেখিয়া তাহার লাভ কি? আমরা এ প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারিব না, তোমরা বাইশ বৎসরের যুবকদিগকে জিজ্ঞসা করিও।

কিয়ৎকাল মধ্যে বৃদ্ধ ও বালিকা উভয়েই জমীদার বাটীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যুগলকিশোর গবাক্ষের অন্তরালে থাকিয়া, বালিকাকে উত্তমরূপে দেখিয়া লইল। তেমন সুন্দরী সে আর কখনও দেখে নাই। মধ্যাহ্ন-রৌদ্রে ভ্রমণ করিয়াও বালিকার মুখশ্রী মলিন হয় নাই; বরং মধ্যাহ্নের নলিনীর ন্যায় আরও প্রস্ফুট হইয়াছিল। ত্রস্তা কুরঙ্গীর ন্যায় তাহার নয়নদ্বয় নিমেষশূন্য হইয়া জমীদার বাবুদিগের বৃহৎ ও সুদৃশ্য অট্টালিকা অবলোকন করিতেছিল। বিমল মধুথ-বিনির্ম্মিত পুত্তলিকার ন্যায় তাহার কোমল অবয়বে যেন জগতের সমস্ত কমনীয়তা বিরাজ করিতেছিল। তাহার নির্ম্মল ওষ্ঠের উপর ক্ষুদ্র নোলকটি, গোলাপদলে শিশির কণার মত জ্বলিতেছিল।

বালিকা পিতার সহিত চলিয়া গেল। সে জানিতে পারিল না, যে তাহার অগোচরে তাহার মধুর মূর্ত্তি একটী নবীন হৃদয়-পটে চিত্রিত হইয়া গেল। শুধু চিত্র নহে; জমীদারের সুন্দর বাটী দেখিয়া বালিকা পিতার সহিত যে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনিও যুগলকিশোরের মুগ্ধ কর্ণে বীণার ঝঙ্কারবৎ বাজিতেছিল।

সে পুনরায় আপন পাঠাগারে যাইয়া উপবেশন করিল এবং একখানা পুস্তক লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। সম্মুখে পুস্তক রাখিয়া, সে বালিকার রূপের ধ্যান করিতে লাগিল।

গোপী বটতলা হইতে প্রত্যাগত হইয়া যুগলকিশোরের পাঠাগারে আসিয়া সংবাদ দিল যে বৃদ্ধ সুস্থ হইয়া কন্যাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন।

যুগল। বুড়োই বুঝি ঐ সুন্দর মেয়েটির বাপ? বুড়োর কোন গ্রামে বাড়ী, তাঁর নাম কি, জিজ্ঞাসা করেছিলে কি?

গোপী। না, নাম ধাম জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

যুগল। তুমি একটি আস্ত বাঁদর!

গোপী। কিন্তু ওর নাম কি, আর বাড়ী কোথায়, তা এখনই জেনে আপনাকে বলতে পারি।

যুগল। কি করে' বলবে? তাঁরা ত চলে' গেছেন। নাম ধাম জানবার জন্যে, তাঁদের পাছু পাছু ছুটবে নাকি?

গোপী। তা' কেন? নায়েব মশায়কে জিজ্ঞাসা করলেই সব পরিচয় এখনই জানতে পারব।

যুগল। নায়েব মশায় ওদের পরিচয় কি করে' জানবেন?

গোপী। ঐ বুড়োর ঐ মেয়েটির সঙ্গে, আপনার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করবার জন্যে, কর্ত্তাবাবু গত অঘ্রাণ মাসে ওদের বাড়ীতে নায়েব বাবুকে পাঠিয়েছিলেন।

যুগল। ওই যে সেই মেয়ে তা তুমি কি করে' জানলে?

গোপী। ঐ বুড়োর মুখেই শুনলাম।

যুগল। তার পর, সে সম্বন্ধ স্থির হল না কেন?

গোপী। ওরা বিয়ে দিতে স্বীকার হল না।

যুগল। কেন?

গোপী। ওরা বড় কুলীন ব্রাহ্মণ।

যুগল। যাও, ঐ কুলীন ব্রাহ্মণের নাম কি আর বাড়ী কোথায়, নায়েব বাবুর কাছে জেনে এস।

গোপী চলিয়া গেল; এবং অল্পকাল মধ্যে প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মণের নাম ধাম জানাইল—কন্যাটির নাম যে গীতা, তাহাও বলিল।

সেই রাত্রে বিছানায় শুইয়া, যুগলকিশোর সারা রাত ঘুমাইল না; গীতার ধ্যান করিল; গীতা নাম জপ করিল। সারারাত গীতার নাকের সেই ক্ষুদ্র নোলকটি তাহার বক্ষোমধ্যে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

যুগলকিশোরের প্রতিজ্ঞা

হারাধন মুখোপাধ্যায় শিবপুরের শ্যালক রত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাটীতে সাতদিন ছিলেন।

এই সাতদিনের মধ্যে একদিন, পাত্রের মাতুল আসিয়া কন্যাকে দেখিয়া গিয়াছিলেন। গীতাকে দেখিয়া তাঁহার পছন্দ হইয়াছিল; হইবারই কথা। আর একদিন হারাধন ও রত্নেশ্বর-বাবু পাত্রকে দেখিতে গিয়াছিলেন। পাত্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া হারাধন বুঝিয়াছিলেন, সে পাত্র চূড়ান্ত কুলীন, এবং

বিভ্যাশিক্ষাও কিছু করিয়াছে, এক্ষণে সে একটি রঙের দোকানে মাসিক কুড়ি টাকা বেতনে সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। পাত্রের বয়সটা একটু বেশী, ত্রিশ বৎসর; তা' হউক, কন্যাও বাড়ন্ত, তের বৎসর বয়স হইয়াছে। পাত্রের আদি বাড়ী বর্দ্ধমান জেলায়, বৈদ্যপুরে; এখনও সেখানে তাহার পৈতৃক জমীজমা ও ভগ্ন ভদ্রাসন আছে। পাত্রের এই সকল পরিচয় পাইয়া দরিদ্র হারাধন পরম তুষ্ট হইলেন। রত্নেশ্বর বাবুও মনে করিলেন, তাঁহার পরম সৌভাগ্য যে এমন একটা কুলীন পাত্র অনুসন্ধানে বাহির করিয়াছেন। স্থির লইল যে গণ, পণ, দান, আভরণ ইত্যাদিতে মোট হাজার টাকা খরচ করিলেই চলিবে; এবং আগামী বৈশাখ মাসেই শুভবিবাহ সম্পন্ন করিতে হইবে। কিন্তু পল্লীগ্রামে যাইয়া বিবাহ দেওয়া অসুবিধা হইবে; উহা শিবপুরে রত্নেশ্বর বাবুর বাটীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

সাতদিন পরে, পরম পরিতুষ্ট মনে, কন্যাকে লইয়া হারাধন স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। রত্নেশ্বর বাবু বলিয়াছিলেন, "হারাধন, গীতাকে এই শিবপুরেই রেখে যাও। এই অল্প ক'দিনের জন্যে, কেন আবার ওকে রতনপুর নিয়ে যাবে? তুমি একলা বাড়ী ফিরে, পাঁচ সাত দিনের মধ্যে অর্থ-সংগ্রহ করে আমার ভগিনীকে নিয়ে এসো।" কিন্তু গীতা পিতাকে একাকী রতনপুরে পাঠাইতে স্বীকৃতা হয় নাই। আসিবার সময়, রাস্তায় যে বিপদ ঘটিয়াছিল, স্মরণ করিয়া সে ভাবিল যে পিতাকে অসহায় অবস্থায় যাইতে দেওয়া নিরাপদ হইবে না। অতএব

বাড়ী ফিরিবার জন্য সেও পিতার সহিত হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়াছিল।

হাওড়া ষ্টেশনে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠিবার সময়, সে পিতাকে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তুমি ঐ ভাল গাড়ীতে উঠ্‌ছ না কেন? ওটা ত খালি রয়েছে।"

হারাধন বলিলেন, "ওরে বাবা! ও গাড়ীতে আমাদিগকে চড়তে দেবে কেন? ও গাড়ীর ভাড়া যে অনেক বেশী। আমরা গরীব মানুষ, আমরা তত ভাড়া কোথায় পাব? ওতে সাহেবেরা আর বড় লোকেরা চড়ে।"

গীতা পিতার সহিত তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতে উঠিয়া, একটি গবাক্ষের নিকট নিজের স্থান করিয়া লইল এবং গবাক্ষ হইতে মুখ বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল যে ঐ ভাল গাড়ীতে কেহ উঠিতেছে কিনা।

যথাসময়ে গাড়ী ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। গাড়ীর গবাক্ষ হইতে গীতা চাহিয়া দেখিল যে সেই গাড়ীতে এক বাঙ্গালী যুবক উঠিল। যুবক দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ; তাহার চোখে সোণার চশমা; তাহার সুগৌর প্রশান্ত ললাটে কুঞ্চিত কেশদাম আসিয়া পড়িয়াছে। গীতা যুবককে চিনিত না। সে তাহাকে আগে কখনও দেখে নাই। কিন্তু আমরা তাহাকে চিনি; সে যুগলকিশোর, পরীক্ষার ফলাফল জানিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়াছিল; তাহা জানিয়া, পিতাকে সংবাদ দিবার জন্য সে ফিরিয়া

বর্দ্ধমানে যাইতেছিল। সে-ই পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরাতে উঠিয়াছিল।

ঠিক সেই দিন, ঠিক সেই গাড়ীতে চড়িয়া, কেন সে বর্দ্ধমানে যাইতেছিল? ইহাকেই হয়ত ভবিতব্যতা বলে।

গীতা যুগলকিশোরকে দেখিয়াছিল; কিন্তু যুগলকিশোর সে সময় গীতাকে দেখে নাই।

গাড়ী ছাড়িল। ষ্টেশনে ষ্টেশনে থামিতে থামিতে গাড়ী ক্রমে তালাণ্ডু ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিল। তালাণ্ডু নূতন ষ্টেশন; সেখানে গাড়ী হইতে নামিবার জন্য বা গাড়ীতে উঠিবার জন্য তখনও প্লাটফরম প্রস্তুত হয় নাই, ভূমি হইতে একেবারে উচ্চ গাড়ীতে উঠিতে হইত। এক বৃদ্ধা একটি দ্রব্যপূর্ণ ধামা মাথায় লইয়া তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছিল, কিন্তু পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। গাড়ীর জানালা হইতে তাহা দেখিয়া, গীতা কাঁদিয়া উঠিল। পর মুহূর্ত্তে সে দেখিল, সেই ভাল গাড়ীর যুবকটি আপন গাড়ী হইতে ভূমিতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল, এবং পতিত বৃদ্ধার দিকে ছুটিয়া আসিল। ধামাটি গুছাইয়া বৃদ্ধাকে তাহাদেরই কামরাতে তুলিয়া দিতে আসিল। আর এক মুহূর্ত্ত পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল; যুবক সেই কামরা হইতে নামিয়া আপনার কামরায় যাইবার সময় পাইল না।

গাড়ী ছাড়িয়া দিলে, যুগলকিশোর সেই কামরাতে গীতাকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল।—সেই পদ্মের মত প্রফুল্ল মুখ; রাঙা ঠোঁটের উপর সেই ক্ষুদ্র নোলক দুলিতেছিল।

বৃদ্ধার পতনে গীতা হৃদয়ে যে ব্যথা পাইয়াছিল, এই যুবকের দ্বারা সেই মনোব্যথা অপনীত হওয়ায়, সে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ নয়নে যুবকের দিকে চাহিয়া রহিল।

যুবককে আপন পার্শ্বে বসিবার স্থান দিয়া বৃদ্ধ হারাধন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথা থেকে বাবুর আসা হচ্চে ?"

"হাওড়া থেকে।"

"কোথায় যাওয়া হবে ?"

"বর্দ্ধমানে।"

"বর্দ্ধমানে কি করা হয় ?"

"বর্দ্ধমানে আমাদের বাড়ী। আপনি কোথায় যাবেন ?"

"আমরা যাব রতনপুরে ; এই মেমারী ষ্টেশনে নামব। এইটি আমার মেয়ে।"

মেমারী ষ্টেশনে আসিয়া গাড়ী থামিল। যুগলকিশোর বলিয়া উঠিল, "দাড়ান, দাড়ান, আমি নেমে আপনার হাতটি ধরে নামাই যে নীচু প্ল্যাটফরম !"—বলিয়া সে অতি সত্বর গাড়ীর দরজা খুলিয়া প্লাটফরমে অবতরণ করিল ; এবং বৃদ্ধের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নামাইল। গীতা কাপড়ের গাঁটরী লইয়া আপনি নামিতে যাইতে ছিল, কিন্তু যুগলকিশোর অতি সত্বর অগ্রসর হইয়া, বাম হস্তে গাঁটরীটি লইয়া, দক্ষিণ হস্তে গীতার করতল গ্রহণ করিল। সেই পরম সম্পদ গ্রহণ করিয়া যুগলকিশোর মুহূর্ত্তমধ্যে ভাবিয়া লইল, "এই পাণিগ্রহণ হইয়া গেল, এখন আমি গীতার, গীতা আমার। আমার গীতাকে কে আমার কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে ?" এই

কথা ভাবিতে ভাবিতে সে গীতাকে গাড়ী হইতে নামাইল, এবং তাহার পিতার নিকট পৌঁছাইয়া দিল।

গাড়ী ছাড়িবার সঙ্কেত হইলে, যুগলকিশোর অগত্যা ছুটিয়া আপন দ্বিতীয় শ্রেণী কামরায় যাইয়া বসিল; গাড়ী ছাড়িল। সেই নির্জ্জন কামরায় বসিয়া সে ভাবিতে লাগিল, যেমন করিয়াই হউক, দুই তিন মাস মধ্যে গীতাকে সে বিবাহ করিয়া গৃহে আনিবে। সে ত জানিত না যে গীতার বিবাহ স্থির হইয়া গিয়াছে এবং এক মাস পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহার বিবাহ হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নৌকাডুবি

যুগলকিশোর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের আই-ই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে; আগামী সোমবার হইতে, তাহাকে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতে হইবে। সে শনিবারেই শিবপুরে আসিয়াছিল। কলেজ হষ্টেলে নিজের স্থান গুছাইয়া রাখিয়া, সে একটু বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল।

হষ্টেলে ফিরিবার সময় কলেজ ঘাটের নিকট আসিয়া সে দেখিল যে ঘাট হইতে দূরে একখানা যাত্রীষ্টীমার দাঁড়াইয়াছে; এবং তাহা হইতে ঘাটে আসিবার জন্য যাত্রী সকল ক্রমান্বয়ে একখানা পানসীতে চড়িতেছে। লোকের পর লোক পানসীতে

নামিতে লাগিল। পান্‌সীর মাঝি চিৎকার করিয়া বলিল, 'আর নয়, আর নয়, পান্‌সী ভারি হয়েছে, আর লোক নিতে পারব না।' কিন্তু নিয়তি যাহাদিগকে টানিয়াছিল, তাহারা সে কথা শুনিবে কেন? তাহারা কেহই মাঝির কথা গ্রাহ্য করিল না; ষ্টীমার হইতে আরও অনেক লোক নৌকায় নামিল। লোকের ভারে, নৌকার প্রায় 'কাণা' অবধি জল উঠিল। মাঝি এই মগ্নপ্রায় নৌকা তীরের দিকে চালিত করিল। দূরে একখানা ষ্টীমার ছুটিয়াছিল। তাহার একটা ঢেউ আসিয়া লোকপূর্ণ নৌকায় সামান্য আঘাত করিল। সেই সামান্য আঘাতে নৌকা একটু হেলিল; নৌকার লোক সকল একটু বিচলিত হইল; নৌকা অন্যদিকে টলিল; নৌকারোহীরা আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল; নৌকা দুলিয়া উঠিল;—মাঝি বলিল গেল গেল। আতঙ্কে আরোহিগণ আর্ত্তনাদ করিল। পর মুহূর্ত্তে নৌকা ও আরোহী জলমধ্যে অদৃশ্য হইল। আরও কয়েক মুহূর্ত্ত পরে, কয়েকজন আরোহী ভাসিয়া উঠিল; তাহাদের মধ্যে কয়েকজন আবার ডুবিল; অন্য কয়েকজন সাঁতরাইয়া তীরের দিকে আসিতে লাগিল। আবার কিয়ৎকাল পরে, দূরে দূরে, জলমগ্নগণের কয়েক খানা অবশ হস্ত জলের বাহিরে দেখা গেল; এবং পরক্ষণেই তাহা আবার অদৃশ্য হইল। তাহার পর, গঙ্গার তর্ তর্ স্রোত যেমন প্রবাহিত হইতেছিল, তেমনই প্রবাহিত হইতে লাগিল।

যে ষ্টীমারের যাত্রীসকল নিমজ্জিত হইয়াছিল, তাহার নাবিক-গণ মগ্ন লোক সকলকে উদ্ধার করিবার জন্য কোন চেষ্টা করে

নাই ; ষ্টীমারের ধারের রেলিং ধরিয়া, বিশুষ্ক নয়নে, এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতেছিল ; স্বজাতির জীবন রক্ষা করিবার জন্য পাপিষ্ঠেরা একটি অঙ্গুলিও উত্তোলন করিল না।' এই নৌকা-ডুবির কথা, এবং ষ্টীমারের নাবিকদিগের ঐ অস্বাভাবিক নির্দ্দয়তার কথা অনেকেই সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছেন, এ জন্য আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিব না।

এই ভয়ঙ্কর নরহত্যার দৃশ্য দেখিয়া যে সকল লোক কলেজ ঘাটে ব্যাকুল নয়নে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের অধিকাংশ কেবল মাত্র দুঃখপ্রকাশই করিল ; সন্তরণ-শিক্ষা বা সৎসাহসের অভাবে জলে নামিল না। কিন্তু দুই চারিজন ব্যক্তি—যে দেবোপম মানবগণ পরের বিপদুদ্ধারের জন্য নিজের জীবনকে বিপন্ন করিতে কাতর নহেন—জলে নামিয়া কতকগুলি মগ্ন লোককে তীরে উঠাইতে লাগিলেন। যুগলকিশোর তিনজন মগ্ন লোককে উদ্ধার করিল। তাহাদের মধ্যে দুইজন সহজেই জ্ঞানলাভ করিয়া আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল। তৃতীয় ব্যক্তির সহজে জ্ঞান লাভ হইল না। যুগলকিশোর কিয়ৎকাল নিজে চেষ্টা করিয়া দেখিল ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া, ভাড়াটিয়া গাড়ী আনাইয়া, তাহাকে হাওড়ার হাঁস্পাতালে লইয়া গেল। সেখানে বহু যত্নে রাত্রি আটটার পর তাহার জ্ঞান জন্মিল।

সে সুস্থ হইলে যুগলকিশোর তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে সে একজন বরযাত্রী ; বরের সহিত কলিকাতা হইতে শিবপুরে আসিতেছিল। বর, বরকর্ত্তা, পুরোহিত, নাপিত এবং

এগারজন বরযাত্রী সকলেই ঐ নিমজ্জিত নৌকায় ছিল। অন্য সকলের কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা সে বলিতে পারে না।

যুগলকিশোর বরযাত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল, "শিবপুরে আপনারা কাদের বাড়ীতে যাচ্ছিলেন ?"

বরযাত্রী। রত্নেশ্বর গাঙ্গুলীর বাড়ী।

যুগল। তিনি কি করেন ?

বরযাত্রী। শুনেছি, হাওড়ার আদালতে মোক্তারি করেন।

যুগল। শিবপুরে তাঁর বাড়ী কোথায় ?

বরযাত্রী। শিবতলা গলি,—নম্বরটা আমার মনে পড়ছে না।

যুগল। তার জন্যে চিন্তা নেই। একটা গলির মধ্যে একটা বিবাহের বাড়ী অনায়াসেই খুঁজে নিতে পারব। তাঁর বাড়ীর দরজায় ফুল পাতার মালা থাকবে, কলাগাছ থাকবে, পূর্ণ কুম্ভ থাকবে; তাঁর বাড়ীর ছাদে হোগলা পাতার ছাউনি থাকবে। এই সকল চিহ্নে বিবাহ বাড়ী সহজেই চিন্‌তে পারব। তা ছাড়া সেটা একজন মোক্তারের বাড়ী; পাড়ার সকলেই তা আমাকে দেখিয়ে দিতে পারবে।

বরযাত্রী। আপনি কি সেখানে যাবেন ?

যুগল। আমার একবার খোঁজ নেওয়া উচিত। বর তীরে উঠতে পেরেছে কিনা বলতে পারি নে। কিন্তু যদি উঠতে না পেরে থাকে, তা হলে ভেবে দেখুন ঘটনাটা কি ভয়ানক হবে! একটা মানুষের জীবন ত গেলই; তার উপর সমাজ শাসনে একটা নির্দ্দোষী বালিকার সমস্ত জীবন বৃথা হয়ে যাবে; সে

চিরকাল পতিতা হয়ে থাকবে। হিন্দু সমাজে আর কেউ কখনও তাকে বিবাহ করবে না; সে আজীবন একটা দুঃখময় জীবন যাপন করবে। কি ভয়ানক!

বরযাত্রী। এই রাত্রেই অপর পাত্র সন্ধান করে যদি তার বিবাহ দেওয়া যায়, তবেই তার বিবাহ হবে।

যুগল। এই রাত্রের মধ্যে নূতন পাত্র কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে?

হঠাৎ একটা কথা যুগলকিশোরের মনে উদিত হইল। বরের অভাবে, এই বরযাত্রীকে লইয়া গিয়া ইহার সহিত বালিকার বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া সে বলিল, "চলুন, আপনি চলুন, বরকে পাওয়া না গেলে, আপনি কন্যাকে বিবাহ করবেন।"

বরযাত্রী। অসম্ভব। শুনেছি, কন্যা মস্ত কুলীন-কুমারী; আমি বংশজ ব্রাহ্মণ, তার উপর বিবাহিত। আপনি কি ব্রাহ্মণ?

যুগল। হ্যাঁ।

বরযাত্রী। আপনিই ত ঐ মেয়েকে বিবাহ করতে পারেন।

যুগলকিশোর গীতার কথা ভাবিয়া বলিল, "আমিও এক রকম বিবাহিত। তা ছাড়া, আমিও কুলীন নই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বর কোথায়

মাঠে যে সময় ফসল না থাকিত, সে সময় গো-যানে আরোহণ করিয়া মাঠের উপর দিয়া রতনপুর হইতে চৌগ্রামে আসা চলিত। বৃদ্ধ হারাধন একখানি গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া, তাহার উপর পুরাতন মাদুর ও শতরঞ্চ দিয়া আচ্ছাদন রচনা করিয়া, পত্নীকে এবং কন্যাকে লইয়া, মেমারী রেল ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। তথায় রেলগাড়ীর জন্য দুই ঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া, গাড়ী পাইয়া হাওড়ায় আসিয়াছিলেন, এবং হাওড়া হইতে শিবপুরে শিবতলা গলিতে শ্রীরত্নেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। আসিয়া কয়েকদিন সেকরার দোকানে আনাগোনা এবং বিবাহের অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন।

আজ বিবাহ। বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে আগন্তুক ভদ্রগণের বাসবার জন্য আসর রচনা করা হইয়াছিল। ঐ আসরের মধ্যভাগে বরের জন্য উজ্জ্বল আসন বিস্তৃত ছিল। ছাদের কড়ি হইতে বেল-লণ্ঠন সকল ঝুলিতেছিল এবং দেওয়ালে দেওয়ালগিরি জ্বলিতেছিল। বরের আসনের দুই পার্শ্বে দুইটি শামাদানে বাতি জ্বলিতেছিল। বাড়ীর ছাদের উপর হোগলাপাতার আচ্ছাদন রচিত হইয়াছিল; সেই আচ্ছাদনতলে একস্থানে রন্ধনাদি হইতে-

ছিল; অবশিষ্ট স্থানে বরযাত্র ও অন্যান্য নিমন্ত্রিতগণের আহারের জন্য কুশাসন সকল বিস্তৃত ছিল। ভিতর বাটীতে দ্বিতলে কলকল-নাদিনী কুলললনাগণ শুভ্র শয্যায় বাসরঘর সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। দ্বারের কাছে, রত্নেশ্বরের দ্বাদশবর্ষীয় পুত্র, গীতাদিদির বিবাহোপলক্ষে রঙ্গিণ জাপানি কাগজে কবিতা ছাপাইয়া, তাহা হস্তে লইয়া হাস্যমুখে ব্যস্ত হইয়া ঘুরিতেছিল। কিন্তু বর কোথায়? বরযাত্রীরা কোথায়?

পাড়ার দুই একজন ভদ্রলোক আসিয়া, আসরে বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। রত্নেশ্বর বাবু ছাদে যাইয়া হৃষ্ট নয়নে দেখিলেন যে ব্যঞ্জনাদি সমস্ত রন্ধন হইয়া গিয়াছে এবং লুচি ভাজা আরম্ভ হইয়াছে। পুরনারীগণ বিচিত্র আলেপন-চিত্রিত পীঁড়ি দুইখানি বরকন্যার জন্য পাতিয়া রাখিলেন; শঙ্খটি খুঁজিয়া হাতের কাছে রাখিলেন, বর আসিলেই বাজাইতে হইবে। নাপিত প্রতিজ্ঞা করিল যে দুই টাকার কম বরের ধুতিখানা ছাড়িবে না। পুরোহিত পঞ্জিকার পাতা উল্টাইয়া বলিলেন যে রাত্রি নয়টা হইতে রাত্রি একটা পর্য্যন্ত শুভলগ্ন আছে। এক ভদ্রলোক পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া, তাহা দেখিয়া বলিলেন যে নয়টা বাজিয়া গিয়াছে। বর কোথায়?

বৃদ্ধ হারাধন অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। সন্ধ্যার পরই বর আসিবার কথা ছিল। রাত্রি নয়টা বাজিল, বর আসিল না কেন? আজ সন্ধ্যার পর ঝড় বৃষ্টি হয় নাই যে তাহার জন্য তাঁহাদের বাহির হইতে বিলম্ব ঘটিয়াছে; আজ শনিবার, বরযাত্রীরা

সকলেই সকাল সকাল আপিস হইতে ফিরিয়াছে। তবে এখনও আসিয়া পৌঁছিতে পারিল না কেন? হারাধন বলিলেন, "বেশী দূর নয় ত, আমি ষ্টীমার ঘাট পর্য্যন্ত এগিয়ে একবার দেখি।" এই বলিয়া তিনি জামা চাদর ও জুতা পরিয়া বাহির হইলেন। সেদিন আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, কাযেই তাঁহার পথ চিনিতে অসুবিধা হইল না।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়, বিবাহ বাড়ীর দরজায় একখানা ফিটন গাড়ী আসিয়া থামিল। বাটীর দরজার সম্মুখে গাড়ী থামিতে দেখিয়া, সোরগোল পড়িয়া গেল; সকলেই মনে করিল, বর আসিয়াছে। বাড়ীর ভিতর স্ত্রীলোকদিগের কাছে সে সংবাদ তৎক্ষণাৎ পৌঁছিল; স্ত্রীলোকেরা পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনি করিল। রত্নেশ্বর বাবু ছুটিয়া দরজার নিকট আসিলেন। কিন্তু তিনি বরকে দেখিতে পাইলেন না। গাড়ী হইতে অন্য এক ব্যক্তি অবতরণ করিল; সে যুগলকিশোর।

যুগলকিশোর হাওড়া হাঁসপাতাল হইতে একটা ফিটন গাড়ীতে শিবপুরের কলেজ হষ্টেলে পৌঁছিয়া, আর্দ্র ও মলিন বসন পরিত্যাগ করিয়া, নির্ম্মল বসন পরিধান করিয়া এবং কিঞ্চিৎ আহারাদি করিয়া আসিয়াছিল। সে গাড়ী হইতে নামিয়া, বাড়ীর দরজায় রত্নেশ্বর বাবুকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "নমস্কার মহাশয়! আপনারই কি এই বাড়ী।"

"হ্যাঁ।"

"আপনারই কি নাম রত্নেশ্বর গাঙ্গুলী?"

"হ্যাঁ।"

"আজ আপনারই কি কন্যার বিবাহ ?"

"কন্যার নহে, আমার কন্যা নেই; আমার ছোট ভগিনীর কন্যার বিবাহ হবে।"

"বর, বরযাত্রীরা এসেছেন কি ?"

"না; এত বিলম্ব হবার কারণ কি, আমরা বুঝতে পারছিনে। মেয়ের বাপ—আমার ভগিনীপতি—অনুসন্ধান করতে গেছেন।"

"বর বরযাত্রী সম্বন্ধে আমি আপনার নিকট একটা সংবাদ নিয়ে এসেছি। সেটা কিন্তু দুঃসংবাদ।"

"কি ?"

"ষ্টীমার থেকে তীরে নামবার জন্যে বর বরযাত্রীরা একখানা নৌকায় উঠেছিলেন। সেই নৌকাখানা ডুবে গিয়েছে। নৌকাতে আরও অনেক লোক ছিল। দশ বারজন ছাড়া নৌকার কোন লোকই তীরে উঠ্‌তে পারে নি। একজন বরযাত্রীকে আমি তীরে তুলিতে পেরেছিলাম; তাঁর মুখে আপনাদের ঠিকানা জেনে আমি সংবাদ দিতে এসেছি। বড়ই অপ্রিয় সংবাদ দিতে হল, আমাকে ক্ষমা করবেন।"

এই সংবাদ অল্পকাল মধ্যে সমস্ত বাটীতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল; আনন্দোৎসব হাহাকারে পরিণত হইল।

এই মহাবিপদগ্রস্ত গৃহস্থকে এই বিপদ সাগর হইতে কিরূপে উদ্ধার করিবে, ইহা ভাবিতে ভাবিতে যুগলকিশোর আসনে গিয়া

উপবেশন করিল। সমাগত লোকদিগের মধ্যে একজন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায়ের সন্ধানে কি কোন সৎপাত্র আছে?"

সহসা যুগলকিশোরের মনে পড়িয়া গেল যে তাহার পরিচিত এবং তাহার পিতার দ্বারা উপকৃত এক যুবক এই শিবপুরেই বাস করে। এই যুবকের মাতা তাহাকে বলিয়াছিলেন যে একটি সুন্দরী পাত্রী পাইলে, তিনি পুত্রের বিবাহ দেন। এই যুবকটি বি-এ পাস করিয়া হাওড়া রেলষ্টেশনে একটি পঞ্চাশ টাকা বেতনের চাকুরী করিতেছিল, এবং ভবিষ্যতে তাহার আরও অনেক উন্নতির আশা ছিল। এই যুবকের কথা স্মরণ করিয়া যুগলকিশোর কহিল, "আমি পাত্র খুঁজে আনব। এই শিবপুরেই আমার জানিত এক ব্রাহ্মণ যুবক আছে। বি-এ পাস করেছে, বয়স চব্বিশ বৎসর। আপনাদের মেয়ে যদি খুব সুন্দরী হয়, তাহলে চেষ্টা দেখি; কারণ তার মা সুন্দরী মেয়ে পান নি ব'লে ছেলের আজও বিয়ে দেন নি।"

কথাটা রত্নেশ্বর বাবুও শুনিলেন। বিপদ সাগরের মধ্যে তিনি যেন একখানা তরণী দেখিতে পাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাত্র কি গোত্র?"

যুগল। সে কি গোত্র তা ত আমি বলিতে পারি নে। সে চট্টোপাধ্যায়, কুলীন বটে, আমি কেবলমাত্র এই জানি।

রত্নেশ্বর। তাঁরা কি মেল জানেন কি?

যুগল। দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমার মনে পড়েছে, ঐ পাত্রের মা একদিন আমাকে বলেছিলেন, যে তাঁরা খড়দা মেল।

রত্নেশ্বর। আহা! ভগবান আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। তিনি আপনাকে আমাদের উদ্ধারকর্ত্তা করে পাঠিয়েছেন। আমাদেরও থড়দা মেল। আপনি সেই পাত্রটি এনে দিন। আমাদের মেয়ে খুব সুন্দরী সে জন্যে ভাবনা নেই। আপনি বরং একবার বাড়ীর ভিতর চলুন, মেয়েটিকে দেখবেন। কিংবা না, আপনি এইখানেই বসে থাকুন, আমি তাকেই এখানে নিয়ে আসি। আপনি তাকে একবার দেখলে বুঝিতে পারবেন, কেমন সুন্দর মেয়ে। ছেলের মাকেও সেকথা বলতে পারবেন।

রত্নেশ্বর বাবু গীতাকে আনিবার জন্য বাটীর মধ্যে যাইয়া এই অপরিচিত যুবকের সদাশয়তার কথা বলিলেন। শুনিয়া সকলেই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গীতার হৃদয়ও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হইয়া রহিল। সেই কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয় লইয়া সে মাতুলের সহিত বহির্ব্বাটীতে আসিল।

শামাদানের আলোক যুগলকিশোরের সুগৌর মুখের উপর পড়িয়াছিল। বাহিরের অন্ধকার হইতে তাহাকে দেখিয়া, গীতা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, এই পরম সুন্দর যুবকটি কি সকল স্থানেই সকলের উপকার করিয়া বেড়ায়! আবার মনে পড়িল, সেই মেমারী ষ্টেশনে তাহার হাত ধরার কথা। বালিকা বুঝিতে পারিল না, সে কথা স্মরণ করিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল কেন।

গীতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া যুগলকিশোর

চমকিয়া উঠিল। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "গীতা! গীতা! তুমি এখানে কেমন করে এলে?"

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন, "আপনি আমার ভাগ্নীকে চেনেন?"

যুগলকিশোর আপনাকে সংযত করিয়া বলিল, "হ্যাঁ; আমি গত চৈত্র মাসে একবার এক গাড়ীতে এঁদের সঙ্গে মেমারী পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম।"

গীতা মনে মনে বিস্মিত হইল। এই যুবক তাহার নাম জানিল কিরূপে? এই যুবক সম্বন্ধে সেদিনকার প্রত্যেক ঘটনাটি গীতা মনে করিয়া রাখিয়াছিল—কৈ তাহার বাবা ত তাহার নামটী ইহাকে বলেন নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

যুগলকিশোর এক মহাসুযোগ পাইয়াছিল; এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া কি সে গীতাকে আপনিই বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিবে? একবার ইতস্তত ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া সে যদি বলে যে তাহার পরিচিত যুবককে পাওয়া গেল না, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তারা নিরুপায় হইয়া নিশ্চয়ই বংশজকে কন্যাসম্প্রদান করিতে আপত্তি করিবেন না; কারণ কন্যা আজীবন অবিবাহিতা থাকা অপেক্ষা ইহাও শ্রেয়ঃ। তখন, অনায়াসে তাহার গীতালাভ

ঘটিবে। যদিও সে কিছুদিন পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, যে কৌশলেই হউক সে গীতাকে বিবাহ করিবে, তথাপি এই সুযোগ পাইয়া, তাহা গ্রহণ করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মিল না। এই দৈব সুযোগের নীচতায় নামিতে তাহার ঘৃণা বোধ হইল।

সেই ভাড়াটিয়া ফিটন গাড়ীটা বিবাহবাটীর দরজাতেই দাঁড়াইয়া ছিল। যুগলকিশোর তাহাতে চড়িয়া তাহার সেই পরিচিত যুবকের অনুসন্ধানে বাহির হইল। তাহার নির্দ্দেশ মত গাড়ী চালিত হইয়া, সেই যুবকের বাটীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আবার ভবিতব্যতার মহাশক্তি প্রকট হইয়া উঠিল। যুগলকিশোর দেখিল, বাটীর দরজায় তালা ঝুলিতেছে; তাহারা বটীতে চাবি বন্ধ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। নিকটে অনুসন্ধান করিয়া জানিল যে তাহারা দুই তিন দিন কোথায় গিয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

অগত্যা সে বিবাহবাটীতে একাকী প্রত্যাগমন করিল; এবং এক্ষণে আপন বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপনে আর কোন প্রকার স্বার্থপরতা ও নীচতা না থাকায়, সে কহিল, "আমি যে ছেলেটির কথা বলেছিলাম, তার সাক্ষাৎ পেলাম না; বাড়ীতে তালাবন্ধ করে সে কোথায় গিয়েছে। আপনাদের যদি অমত না হয়, আর আমি যদি নিতান্ত অযোগ্য পাত্র না হই, তা হলে আমার সঙ্গে পাত্রীর বিবাহ দিতে পারেন। আমি এই শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র, আমার পিতা বর্দ্ধমানের উকিল। আমার নাম যুগলকিশোর চক্রবর্ত্তী।"

সমাগত ব্যক্তিগণের মধ্যে তখনও যাহারা আসরে বসিয়া ছিলেন তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আমি আপনাকে চিনেছি; আপনি আমার জামাতার সঙ্গে একত্রে শিবপুর কলেজে পড়েন। আপনি আমার জামাতার সঙ্গে একবার আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন, এখন একথা আমার বেশ মনে পড়ছে।"

যুগলকিশোর বলিল, "আপনি রমণকৃষ্ণের শ্বশুর, এইবার আমি আপনাকে চিনেছি।"

পুরোহিত বলিলেন, "রাত্রি বারটা বাজল; আর একঘণ্টা মাত্র লগ্ন আছে; যা হোক একটা ব্যবস্থা শীঘ্র করে ফেলুন।"

যুগলকিশোর কহিল, "আমি বংশজ, আপনারা কুলীন, এই একটা আপত্তি আপনাদের হতে পারে। কিন্তু এই রাত্রে, এক ঘণ্টার মধ্যে আপনারা কুলীন পাত্র কোথায় পাবেন?"

সমাগতগণ বলিলেন যে, যখন হারাধন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সন্তান নাই, তখন বংশজের সহিত এরূপ ক্ষেত্রে কন্যার বিবাহ দিলে কোনও ক্ষতি হইবে না।

রত্নেশ্বর বাবু বলিলেন, "আমি কিছুই ঠিক করতে পারছি নে। আবার এই সময় হারাধন কোথায় গিয়ে বসে রইল!"

যে ভদ্রব্যক্তি যুগলকিশোরের পরিচয় জানিতেন, তিনি বলিলেন, "তাঁর অভাবে আপনিই কন্যার মাতার মত নিয়ে কার্য্য করতে পারেন। আর আমি জোর করে বলছি যে পাত্র অতি অতি সৎ, আমার জামাতা সর্ব্বদা এর সুখ্যাতি করে থাকেন।"

ভগিনীর নিকট যাইয়া রত্নেশ্বর বাবু তাহাকে সকল কথা শুনাইলেন।

মাতা, যুগলকিশোরের সেই একদিনকার গল্প কন্যার মুখে শুনিয়াছিলেন। তাহাতে বুঝিয়াছিলেন যে কন্যা যদি সেইরূপ বর লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে সে চিরসুখিনী হইবে। হারাধনও একদিন গৃহিণীর নিকট যুগলকিশোরের সৌন্দর্য্যের সুখ্যাতি করিয়া বলিয়াছিলেন, যে হাঁ সুন্দর বটে; যাহারা এরূপ সুন্দর জামাতা লাভ করিতে পারে, তাহাদের জীবন সার্থক হয়। এই সকল কথা মনে করিয়া এবং এই অঘটন ঘটনায় বিধাতার হাতের খেলার পরিচয় পাইয়া, তিনি বলিলেন, "দাদা, আমি এই নূতন পাত্রকে জানালা থেকে দেখেছি; এ বিয়েতে আমার একটুও আপত্তি নেই। তিনিও বাড়ী ফিরে আপত্তি করবেন না। দেখছ না, এ ত আমাদের মানুষের পছন্দ করা বর নয়; এ ভগবানের পাঠিয়ে দেওয়া বর; এমন বর কোথায় পাবে?"

রত্নেশ্বর বাবু বহির্ব্বাটীতে আসিয়া পুরোহিতকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি কন্যা সম্প্রদান করব, আপনি শীঘ্র উদ্যোগ করে নিন।"

ঐ বাক্যের সহিত বাটীতে আবার আনন্দোৎসব ফিরিয়া আসিল। পুনঃ পুনঃ শঙ্খধ্বনিতে দিক্ সকল পুলকিত হইয়া উঠিল। সেই শঙ্খধ্বনির মধ্যে গীতা আসিয়া তাহার পুলকাবেগ কষ্টে সম্বৃত করিয়া, আবেগভরে ঈষৎ কম্পিত ও মন্ত্রপূত হস্তখানি

বাড়াইয়া দিল; যুগলকিশোর আপন মন্ত্রপূত হস্তে তাহা গ্রহণ করিল। বিবাহ হইয়া গেল।

বিবাহের পর বাসরঘরে বসিয়া যুগলকিশোর তাহার পিতাকে পত্র লিখিল। লিখিল যে, তিনি রতনপুর নিবাসী হারাধন মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেই কন্যাকে কোন অভাবনীয় কারণে অত্যরাত্রেই তাঁহার অনুমতি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই সে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছে; আগামী সোমবার কলেজের প্রিন্‌সিপ্যালের নিকট সাত দিনের ছুটি লইয়া নবপরিণীতা বধূকে লইয়া সে দেশে ফিরিবে।

হারাধন গঙ্গার ঘাটে ঘাটে সারারাত নিমজ্জিত পাত্রের অনুসন্ধান করিয়া নিশাবসানে বাটী ফিরিয়া আসিলেন। বাটী আসিয়া শুনিলেন যে কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বংশজ পাত্রের সহিত কুলীন-কুমারীর বিবাহ দিতে হইল বলিয়া তিনি কিছু বিমর্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু জামাতাকে দেখিয়া, এবং তাহার পরিচয় পাইয়া তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না—বারংবার বলিতে লাগিলেন—ইহাকেই বলে ভবিতব্যতা।

যুগলকিশোর সোমবার দিন সকালে কলেজের প্রিন্‌সিপ্যালের সহিত সাক্ষাৎ করিল। প্রিন্‌সিপ্যাল তাহার আই-এ পরীক্ষার উৎকৃষ্ট ফল দেখিয়া তাহার উপর বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন; তাহার উপর সেইদিন প্রত্যুষের সংবাদপত্র পড়িয়া তিনি জানিয়াছিলেন যে, তাঁহারই কলেজের যুগলকিশোর নামক একটি ছাত্র, আপন

জীবন বিপন্ন করিয়া, জলনিমজ্জিতগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিল ; ইহাতে তিনি আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। কাযেই যুগলকিশোর সহজেই এক সপ্তাহের ছুটি পাইল। ছুটি পাইয়া সে হাওড়া ষ্টেশনে যাইয়া, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ করিয়া আসিল এবং বেলা এগারটার গাড়ীতে নববধূকে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিল।

প্রণয়-পরীক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদ

"স্ব।"

বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা সামান্য মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলে, কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে বাটীর প্রস্তুত জন্য যে জল ব্যয় হইয়াছিল, তাহার মূল্যও পাওয়া গেল না; হেমেন্দ্রনাথ মিত্র যখন এম-এ ও বি-এল পাশ করিয়া কেবল মাত্র একটি সত্তর টাকা বেতনের পেস্কারি পদে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন সেও এই উক্তির অনুকরণ করিয়া বলিত যে তাহার পঠদ্দশায় যে কালীর খরচ হইয়াছিল, তাহাও চাকুরীর দ্বারা আদায় হইল না। বস্তুতঃ চাকুরীর সেই সামান্য আয়ে, সে সংসারের কোনও খরচ সুচারুরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। ক্ষুদ্র বাসাবাটী এবং তাহাতে একটি মাত্র বৃদ্ধা পরিচারিকা তাহার পছন্দ হইত না। স্ত্রীর বস্ত্রালঙ্কার, বৃদ্ধা মাতার আহার, এবং অপর্য্যাপ্ত গৃহসজ্জা, কিছুই তাহার মনের মত হইত না। মাসিক সত্তর টাকা আয়ে বেচারার মনের কোন অভিলাষই পূর্ণ হইত না।

কিন্তু এই দৈন্যের ভিতর সে এক অসীম সম্পদের অধিকারী ছিল। এক সুন্দরী ও যুবতী পত্নীর অপ্রমেয় প্রেম তাহার সমস্ত

অভাব পূর্ণ করিয়া রাখিত ; দৈন্যের কালিমা প্রবল প্রেম-প্রবাহে বিধৌত করিয়া দিত। তাহার পত্নীর গুণে সে তাহার অর্থাভাবের কথা ভুলিয়া যাইত। গুণময়ী পত্নীর সযত্ন রন্ধনের গুণে তাহার সামান্য ব্যঞ্জন সকল অমৃতময় হইয়া উঠিত। পত্নীর অনলস অধ্যবসায়ে তাহার দীনগৃহ, ভক্তের পুষ্পপাত্রের ন্যায়, সর্ব্বদা পরিস্কৃত সজ্জিত ও সুবাসিত থাকিত। পত্নীর সুচারু নিপুণতায়, তাহাদের পরিধেয় সকল সর্ব্বদা অমলিন ও অক্ষুণ্ণ থাকিত।

হেমেন্দ্রনাথও স্ত্রীকে ভালবাসিত ;—প্রাণ ভরিয়া ভালবাসিত। স্ত্রীর বস্ত্রালঙ্কারের অভাব অগাধ ভালবাসায় পূর্ণ করিয়া দিত। তেমন স্ত্রী ; তাহাকে না ভালবাসিয়া কি থাকিতে পারা যায় ? হেমেন্দ্রনাথ নিভৃতে ভার্য্যার মুখচুম্বন করিয়া বলিত যে, স্বর্গের অমৃত অপেক্ষা তাহা মধুর—পৃথিবীতে তাহার কোন তুলনা নাই। এই ভার্য্যার নাম সুলেখা।

হেমেন্দ্রনাথের পিতার পল্লীগ্রামের বাটী সংস্কার অভাবে ভূমিসাৎ হইয়াছিল। তিনি কখনও দেশে যাইতেন না। কলিকাতার ভাড়াটিয়া বাসাবাটীতে থাকিয়াই কোনও আফিসে কার্য্য করিতেন ; বেতন পাইতেন দুই শত টাকা। সেই অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি পুত্রকে সুশিক্ষিত করিতে পারিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু তাহার জন্য একটি কপর্দ্দকও রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহার মৃত্যুর পর হেমেন্দ্রনাথ বিলক্ষণ বিপদে পড়িল। পত্নী ও মাতার অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া, সে কোনক্রমে পিতার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিল। তাহার পর সম্পূর্ণ নিঃস্ব অবস্থায় পড়িয়া,

ওকালতির দ্বারা অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করিল, কিন্তু একটিও মক্কেল যুটিল না। সে নানালোকের নিকট চাকুরীর জন্য উমেদারী করিল, কোথাও একটি সুবিধা মত চাকুরী খুঁজিয়া পাইল না। অবশেষে অর্থাভাবে একান্ত নিরুপায় হইয়া সে সত্তর টাকা বেতনে পেস্কারের পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। হেমেন্দ্রনাথ বর্দ্ধমানের জেলা জজের পেস্কার হইল;—লোকে বলিল, জজের পেস্কারের পদে বেশ দু'পয়সা উপরি পাওনা আছে।

হেমেন্দ্রনাথ ঐ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে বর্দ্ধমানে আসিয়াছে। আসিয়া রাণীগঞ্জ নামক পল্লীতে একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর মাসিক চৌদ্দ টাকা ভাড়ায় একটি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাটী ভাড়া লইয়াছে। পরে একজন পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়া, বিধবা মাতা ও পত্নীকে কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে লইয়া আসিয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ প্রত্যহ প্রাতে রাণীগঞ্জের বাজার হইতে মাতার রাত্রের আহারের জন্য ফল মূল ইত্যাদি ও রন্ধন জন্য মাছ তরকারি আনিয়া দিত। সুলেখা ততক্ষণ স্নান করিয়া বাটনা বাটিয়া, ডাল রাঁধিয়া, ভাত চড়াইয়া বসিয়া থাকিত। স্বামী বাটীতে প্রত্যাগত হইলে, সে তাড়াতাড়ি মাছ তরকারি কুটিয়া, ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিত এবং বেলা দশটার পূর্ব্বেই স্বামীকে আহার করিতে দিত। মাতা আহার স্থানে বসিয়া পুত্রকে আহার করাইতেন। ঝি জল আনিত, বাসন মাজিত, কাপড় কাচিত এবং ঝাঁড় দিত।

বর্দ্ধমানে আসিয়া অবধি হেমেন্দ্রনাথ একদিনও আফিস কামাই

করে নাই। সে প্রতিনিয়ত আদালতে যাইত; কিন্তু হায়! নিতান্ত অবোধ বালকের মত, সে এক পয়সাও উপরি পাওনা গ্রহণ করিত না। তাহার সহকর্ম্মচারিগণ বলিত, এই নূতন পেস্কার তাহাদের সেরেস্তাটা একেবারে মাটি করিয়া দিবে।

সুলেখা কাহার নিকট পেস্কারদের উপরি পাওনার কথা শুনিয়াছিল। এ সম্বন্ধে হেমেন্দ্রনাথের মত কি তাহা জানিবার জন্য সে একদিন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এতে দোষ কি? সকল লোকেই ত এই রকম নিয়ে থাকে!"

এ কথার উত্তরে হেমেন্দ্রনাথ বলিল, "সু! তোমার স্বামী আমি, আমি কখনও কু হতে পারব না।"—হেমেন্দ্রনাথ সুলেখাকে সংক্ষেপে 'সু' বলিয়া সম্বোধন করিত।

শুনিয়া সুলেখা বলিল, "না, তোমার কু হতে হবে না। ও আমি তোমাকে তামাসা করে বলেছিলাম। কেন, এই পয়সায় ত আমাদের বেশ চলে যাচ্ছে। আমাদের কিসের অভাব আছে?"

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, "অভাবের অসদ্ভাব নেই। কিন্তু চোর হওয়ার চেয়ে দীন হওয়া ভাল।"

যে গলিতে হেমেন্দ্রনাথ বাস করিত, তাহা যেস্থানে বড় রাস্তায় আসিয়া মিলিয়াছিল, সেখানে একটা বড় বাড়ী ছিল। সেই বাড়ীতে একজন সবজজ বাস করিতেন। সবজজ বাবুর সন্তানাদি ছিল না। সম্প্রতি তাঁহার তৃতীয় পক্ষের পত্নীর একটি পুত্রসন্তান হওয়ায়, তাঁহার আহ্লাদের সীমা ছিল না। পরিণত বয়সের এই

পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তিনি পাড়ার সমস্ত স্ত্রীপুরুষগণকে আহারে আহ্বান করিয়াছিলেন।

হেমেন্দ্রনাথ তৎসংবাদ সুলেখাকে প্রদান করিয়া কহিল। "সু, তোমার ত কোনও অলঙ্কার নেই; তুমি কি পরে' সবজজ বাবুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাবে?"

সুলেখা হাসিয়া বলিল, "কেন, সর্ব্বাঙ্গ অলঙ্কারে ঢেকে না গেলে তারা কি আমায় খেতে দেবে না?"

হেমেন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "কিন্তু স্ত্রী-সমাজের মধ্যে একটু সম্মান বজায় রাখতে হলে, দু' চারখানা চক্‌চকে অলঙ্কারের খুব প্রয়োজন আছে।"

সুলেখা আপন সুন্দর বাহু তুলিয়া কাচের চুড়ি ক'গাছি ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, চক্‌চকে গহনার বদলে এই চুড়ি পরেছি বলে কি আমাকে মন্দ দেখাচ্ছে?"

হেমেন্দ্রনাথ সুলেখার হাত ধরিয়া তাহাকে আপন বক্ষের নিকট টানিয়া আদর করিয়া কহিল, "মন্দ দেখাবে কেন?—এমন সুন্দর হাত কার আছে? কিন্তু তোমার স্বামীকে লোকে দরিদ্র বলে বুঝবে।"

সুলেখা বলিল, "তাতে আমার গায়ে ফোস্‌কা পড়বে না।"

হেমেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার স্বামীকে কেউ গরিব ভাবলে, তোমার অপমান বোধ হয় না?"

সুলেখা বলিল, "কেন হবে? আমি হিন্দুর মেয়ে, আমি কি জানি নে যে মহাদেব দরিদ্র হলেও, ভগবতীর চিরপূজ্য?"

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, "তুমি ঠিক বলেছ সু; আমাদের দেশে যতদিন ঐ উচ্চ আদর্শ থাকবে, ততদিন আমরা অর্থগৌরবকে সকল গৌরবের নিম্নে রাখব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুরমা

সুলেখা সবজজ বাবুর বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়া, তাঁহার পত্নীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে ত আর কেহ নয়;—সে যে সুরমা; মহাকালী পাঠশালায় তাহারই সহপাঠিনী। স্মরণাতীত শৈশব হইতে তাহারা একত্রে খেলা করিয়াছে, একত্রে জলখাবার খাইয়াছে, একত্রে মনের কথা কহিয়াছে, একত্রে হাসিয়াছে;—সুলেখার তেমন সখী আর কেহ ছিল না। বিবাহের পর আর তাহাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। আজ হঠাৎ পরস্পরের সাক্ষাৎ ঘটায়, তাহাদের আনন্দের সীমা রহিল না। সুরমা সুলেখাকে নির্জ্জন কক্ষে লইয়া কত কথাই কহিল। এই বাক্যালাপের সময় স্থির হইয়া গেল যে, প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে যখন স্বামিগণ কাছারীতে থাকিবেন, তখন উভয়ে উভয়ের বাটীতে যাইয়া হাস্যকৌতুকে দিবা অতিবাহিত করিবে।

এই পরামর্শ অনুযায়ী পরদিন দ্বিপ্রহরে সুরমা এক পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া হেমেন্দ্রনাথের বাসাবাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুলেখা তখন গৃহকার্য্যে ব্যস্ত ছিল। সে তাহার কার্য্য ত্যাগ করিয়া, একমুখ হাসি হাসিয়া তাড়াতাড়ি আসিয়া সুরমার হাত ধরিল; বলিল, "চল্; উপরে চল্; সেখানে আমার শ্বাশুড়ী আছেন; সেখানে একটু বসবি চল্।"

সুরমা উপরে উঠিয়া সুলেখার শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে প্রণাম করিল।

সুলেখা সখীর পরিচয় প্রদান করিল। পরে তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, "ভাই, তুই বসে বসে আমার শ্বাশুড়ীর সঙ্গে কথা ক', আমি নীচে গিয়ে, ভাঁড়ার ঘরটা গুছিয়ে তোর জন্যে দুটা পাণ সেজে আনি।"

সুরমা বলিল, 'তুই একটু দাঁড়া, সুলেখা, আমি মার সঙ্গে দুটো কথা কয়ে তোর সঙ্গে নীচে যাব; তোর কেমন ভাঁড়ার ঘর দেখব।"

উপরে অল্পক্ষণ থাকিয়া উভয় সখীতে নিম্নে আসিল। সুরমা ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে উহা তাহাদের ভাণ্ডার ঘরের ন্যায় অপরিচ্ছন্ন ও আবর্জ্জনাপূর্ণ নহে। ঘরের দুই কোণে দুইটি ছোট ছোট জালা আছে; সুরমা দেখিল, তাহার একটিতে আলোচাল এবং অপরটিতে সিদ্ধ চাউল রহিয়াছে। তৃতীয় কোণে একটি মৃৎপাত্রে কিছু জল এবং ঐ জলের মধ্যে একটি ভাঙ্গা কলসীর কাণা বসান আছে সেই কাণার উপরে একটি বড় গুড়ের কলসী, একটি হরিদ্রালিপ্ত নারিকেলের মালাদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া সম্পূর্ণ পিপীলিকা ও মক্ষিকা শূন্য অবস্থায় বিরাজ করিতেছে। ঘরের চতুর্থ কোণে একটি কেরোসিনের বাক্সের

উপর দুইটি বিড়া, বিড়ার উপর কৃষ্ণবর্ণ তৈলভাণ্ড ও ঘৃতভাণ্ড ঘরের উত্তরদিকের দেওয়ালের নিকট কয়েকটি কেরোসিনের বাক্স সারি দিয়া বসান রহিয়াছে, উহা একটি লম্বা বেঞ্চের আকার ধারণ করিয়াছে; সেই বেঞ্চের উপরে কতগুলি এক আকারের কলসী বসান আছে, এই কলসী গুলিতে নানাপ্রকারের দাল, আটা, ময়দা ইত্যাদি ছিল। প্রত্যেক কলসীর মুখে এক একটি সরা চাপা হাঁড়ি, এই হাঁড়িগুলিতে নানাপ্রকারের বড়ি, শুষ্ক কুল, আমসী, বাতাসা, চিনি, মিছরী ইত্যাদি রক্ষিত। ঘরের দক্ষিণদিকের দেওয়ালের নিকট, দুইটি জালার মধ্যস্থলে, উপরি উপরি চারিটি কেরোসিনের বাক্স সাজান, উহা একটি শেলফের কার্য্য করিত। উহার নিম্ন থাকে পাণ সাজিবার উপকরণগুলি স্থাপিত, দ্বিতীয় থাকে কতকগুলি অতিরিক্ত তৈজস ঝক্ ঝক্ করিতেছে, তৃতীয় থাকে কতকগুলি সাদা বোতলে, নানাপ্রকারের মশলা রক্ষিত আছে। চতুর্থ থাকে চা পানের উপকরণ ও পাত্র সকল সজ্জিত।

ভাঁড়ার ঘরের এই সুশৃঙ্খলা দেখিয়া সুরমা বলিল, "এর কোনখানটা গোছাবি? এত সবই গোছান আছে; এমন গোছান ভাঁড়ার ঘর আমি কখনও দেখি নি!"

সুলেখা বলিল, "একবার দেখতে হবে, সকল হাঁড়ি কলসীতে ঢাকা আছে কি না। আর বোতল গুলোয় ধুলা হয়েছে, ওগুলো ভিজে কাপড় দিয়ে মুছতে হবে; আর পাণ সাজা ঘরটায় একবার ঝাঁড দেব, আর একবার দেখব কোনও জিনিষ ফুরিয়ে গেছে

কি না। তিনি বিকালে বাড়ী ফিরে জলখাবার খেয়ে, যে জিনিষটি ফুরিয়ে গেছে তা দোকান থেকে এনে দেবেন।"

সুরমা জিজ্ঞাসা করিল, "তোর বর বিকালে কি খায়?"

সুলেখা বলিল, "সকালের রান্না সেরে, চার পাঁচ খানা পরোটা করে রাখি; বিকালে বাড়ী এসে তাই একটু চিনি দিয়ে খান। সব খান না; দুই এক খানা আমার জন্যে পাতে ফেলে রেখে যান।"

ভাঁড়ার ঘরের পরিচ্ছন্ন মেঝের উপর বসিয়া, সুরমা বলিল, "তোর বর ত তোকে খুব ভালবাসে! আহা! বেচারা আপনি না খেয়ে তোর জন্যে রেখে যায়। এ মুখের ভালবাসা নয়, এ সত্যিকার ভালবাসা।"

সুলেখা নিকটে পাণ সাজিতে বসিয়া, হাসিয়া বলিল, "বোধ হয়ত, যে সত্যিই ভালবাসেন। আর ভাল না বাসবার ত কোন কারণ নেই, ভাই।—এমন কনেটি কোথায় পাবেন?"

সুরমা বলিল, "কনে ভাল হইলেই বুঝি সকল বর ভালবাসে? কেন, তুই কি শুনিস্ নি যে কত পুরুষ ভাল বৌ ঘরে ফেলে, ঝাঁটা লাথি খাবার জন্তে পয়সা খরচ করে রঙ করা কাল পেঁচীদের দরজায় গিয়ে হত্যা দেয়। কতকগুলো পুরুষ আছে, যারা মোটেই ভালবাসতে জানে না; তারা কাল পেঁচীদের বাড়ীতে গিয়ে, পাঁচ জনের দেখাদেখি, ভালবাসার একটা অভিনয় করে শুধু। তোর বর ভালবাসতে জানে; তুই যা বললি, তা শুনে আর তোর ঘরদোর দেখে মনে হয় সে সত্যিই তোকে ভালবাসে।"

সুলেখা। এখন ত ভালবাসেন ; কিন্তু কখনও যদি কোন কালপেঁচীর হাতে পড়েন তা হলে, কি করবেন বলা যায় না।—শুনে'চ কালপেঁচীরা নাকি যাদুমন্ত্র জানে।

সুরমা। তুই কখন তোর বরের প্রণয় পরীক্ষা করে দেখেছিস্ ?

সুলেখা। সে কি রকম ?

সুরমা। মনে কর্ তুই একজন নাচওয়ালীকে ডেকে তোর বরের মন ভোলাবার জন্যে চেষ্টা করতে বল্‌লি ; তাতে যদি তোর বরের মন না টলে, তা হলেই জানতে পারবি যে তোর দিকে তার ভালবাসাটা আন্তরিক ভালবাসা।

সুলেখা। না ভাই, এমন পরীক্ষায় কায নেই। শেষকালে, কেচোঁ খুড়তে সাপ বের হয়ে পড়বে !

সুরমা। আচ্ছা, আমি তোকে এমন একটা উপায় বলে দিব, যাতে তোর কোন ভয়ই থাকবে না ; অথচ তুই বুঝতে পারবি তোর স্বামীর ভালবাসা কতটা গভীর। আমিও সেই উপায়ে আমার বুড়ো বরের ভালবাসাটা খুব যাচাই করে নিয়েছিলাম।

সুলেখা। সবজজ বাবু তোকে খুব ভালবাসেন, নয় ?

সুরমা। বাসবে না ? প্রথম দুটিকে হারিয়ে মনে খুব ভয় হয়েছে ; তাই, এই শেষেরটিকে শত বন্ধনে বেঁধে রেখেছে। তার পর, ছেলে মেয়ে ছিল না, এই আমার কোলে বংশধর হয়েছে।—বুড়ো বয়সে হাতে যেন স্বর্গ পেয়েছে। যতক্ষণ বাড়ীতে থাকে, ছেলেকে আর ছেলের এই মাকে একদণ্ড চক্ষের অন্তরাল করে

না। সেই জন্যেই ত সংসারের কায কর্ম্ম কিছুই দেখে উঠতে পারি নে, ঝি চাকরে যা করে। তা, তাদের দিয়ে কি কোন কায সুশৃঙ্খলায় হয়? আমার ভাঁড়ার ঘর যদি দেখিস্, ত ঘেন্নায় মরে যাস!'

সুলেখা। আমি কাল গিয়ে, তোর ভাঁড়ার ঘড় গুছিয়ে দিয়ে আসব।

সুরমা। যাস। আর, কালকে তোকে শিখিয়ে দেব, কেমন কোরে তোর বরের প্রণয় পরীক্ষা করতে হবে। আমাদের বাড়ীতে যাবার একটা সংক্ষেপ ও নির্জ্জন পথ আছে, তোকে সেই পথটা আজ চিনিয়ে দেব। সেই পথ দিয়ে গেলে আর সদর রাস্তায় বার হতে হবে না, অথচ খুব শীগ্‌গির যাওয়া চলবে। তোদের বাড়ী কোনটা তা চিনে নেবার জন্যে, আজ সকালে ঝিকে নিয়ে, ছাদে উঠেছিলাম। দেখলাম, তোদের বাড়ীর পশ্চিমদিকে যে আম বাগান আছে, তা আমাদের বাড়ীর উত্তর দিক পর্য্যন্ত গিয়েছে। তোর বাড়ীর পশ্চিমদিকে যে দরজা আছে, তা খুলে ঐ বাগানে যাওয়া যায়।

সুলেখা। ও দরজায় সর্ব্বদা চাবি বন্ধ থাকে।

সুরমা। ঐ চাবি খুলে, তুই বাগানের ভেতর দিয়ে, একেবারে পুকুরের ঘাটে গিয়ে উঠবি। ঘাট থেকে আমাদের ভিতর বাড়ীতে ঢোকবার দরজা আছে। আজ তোকে সঙ্গে করে এ পথ দিয়েই ফিরব, তাহলে পথটা তোর জানা হয়ে যাবে।

সুলেখা। ঐ বাগান আর পুকুর কাদের তা তুই জানিস্?

সুরমা। আমাদের বাড়ীটা যাদের, ঐ বাগানও তাদের; আমরা বাগান পুকুরও জমা নিয়েছি। এই বাগানের পথে আনাগোনা করলে, তোর বরের প্রণয় পরীক্ষার ভারি সুবিধা হবে। হ্যাঁ, একটা কথা তোকে জিজ্ঞাসা করছিলাম।—আমার সঙ্গে পূর্ব্ব থেকে যে তোর আলাপ আছে, একথা কি তোর বরকে বলেছিস?

সুলেখা। না, সে কথা এখনও বলা হয় নি। কাল তোদের বাড়ী থেকে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। বাড়ী ফিরে দেখলাম, উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাই রাত্রে বলা হল না। সকালে আমার ঘুম ভাঙলে দেখলাম যে তিনি উঠে গেছেন। আজ বিকালে বাড়ী এলে বলব।

সুরমা। না, না—বলিস নে। ও কথাটা একেবারে গোপন রাখতে না পারলে, তোর প্রণয় পরীক্ষার সুবিধে হবে না। আর, আমি যে তোদের বাড়ীতে এসেছি, কি তুই যে আমাদের বাড়ীতে যাবি, তাও তোর বরের কাছ থেকে গোপন রাখতে হবে।

সুলেখা। তা কি করে হবে? আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কায করি নে।

সুরমা। এ যে প্রণয় পরীক্ষা! এতে কিছু লুকোচুরি করলে দোষ হবে না।

সুলেখা। কিন্তু আমাদের বাড়ীতে তুই এসে ছিস এ কথা যদি মা বলে দেন?

সুরমা। তা তিনি যাতে না বলেন, আমি বাড়ী ফেরবার আগে তার উপায় করে যাব।

অতঃপর দুই সখীতে মিলিয়া হেমেন্দ্রনাথের প্রণয়পরীক্ষা সম্বন্ধে কি কি করা আবশ্যক তাহা স্থির করিয়া লইল। তাহা স্থির করিতে করিতে তাহারা কত হাসিই হাসিল। সুলেখা ভাবিল, কয়েক দিন কি আমোদেই কাটিয়া যাইবে!

সুলেখার পাণ সাজা শেষ হইয়াছিল। এক্ষণে সে সখীকে দুইটি পাণ খাইতে দিয়া এবং নিজে একটি খাইয়া তাহাকে লইয়া পুনরায় উপরে উঠিল।

সুরমা সেইখানে বহুক্ষণ সখীর সহিত গল্প করিয়া, বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বে হেমেন্দ্রনাথের মাতার নিকটে যাইয়া কহিল, "মা, আমি যে আপনাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিলাম, তা যেন আপনার ছেলে জানতে না পারেন। জানতে পারলে হয়ত কথাটা আমাদের বাবুর কাণে উঠবে; বুড়ো মানুষ হয়ত রেগে যাবেন; আর আমার আপনাদের বাড়ীতে আসা ঘটবে না।"

মাতা সম্মতা হইলেন যে তাঁহাদের বাটীতে সবজজ বাবুর গৃহিণীর আগমনবার্ত্তা তিনি প্রকাশ করিবেন না।

সুলেখা সুরমার সহিত যাইয়া বাগানের নির্জ্জন ও সংক্ষেপ পথটা চিনিয়া আসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মনোরমা।

পর দিন অপরাহ্লকালে অবসন্ন দেহে হেমেন্দ্রনাথ বাটী ফিরিতেছিল। সবজজ বাবুর বাটীর নিম্ন দিয়া সে আপন বাটীতে যাইবার জন্য গলি রাস্তায় প্রবেশ করিতেছিল। হঠাৎ সে রাস্তায় দণ্ডায়মান হইল। তাহার মাথায় কি একটা সামান্য দ্রব্য পতিত হইয়া রাস্তায় পড়িয়াছিল; তাহা কি, সে তাহার অনুসন্ধান করিল। দেখিল, কুণ্ডলীকৃত সাদা কাগজের একটি চটকাডিম্বাকার গোলক, রাস্তার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। সে বুঝিল, সবজজবাবুর বাড়ী হইতে কেহ উহা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে, দৈবক্রমে উহা তাহার গায়ে লাগিয়াছে।

উহাতে আর মনোযোগ দেওয়া বৃথা, ইহা মনে করিয়া সে দুই পদ অগ্রসর হইল। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া, সে আবার দাঁড়াইল। ভাবিল, ঐ গোলকটি সবজজবাবুর বাটী হইতে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া, কেহ নিক্ষেপ করে নাই ত? কেন— তাহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ কাগজ নিক্ষেপ করিবার কারণ কি? সে একটু চিন্তা করিয়া দেখিল যে এইরূপ কাগজ নিক্ষেপের কোন কারণ আছে কি না, তাহা কাগজটি পরীক্ষা করিয়া না দেখিলে, জানিতে পারা যাইবে না।—হয়ত ঐ বাড়ীর ভিতর কোনও অসহায় ব্যক্তি কোন বিপদে পড়িয়াছে; বিপদে পড়িয়া

তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছে। অতএব কাগজটি তুলিয়া লইয়া দেখা উচিত, উহাতে কিছু লেখা আছে কি না।

এই মনে করিয়া, পথের উপর কাগজটি যে স্থানে পতিত ছিল, হেমেন্দ্রনাথ সেই স্থানে প্রত্যাগত হইল; এবং উহা উঠাইয়া লইল। তাহার পর, চিন্তিত মনে মন্থর গমনে বাটীর দিকে অগ্রসর লইল।

বাটীতে পৌঁছিয়া কাগজটি সম্প্রসারিত করিয়া দেখিল যে, স্ত্রীলোকের হস্তাক্ষরে উহাতে লিখিত আছে—

"প্রণাধিক,

আমি তোমাকে রোজ দেখি, দেখিয়া ভালবাসিয়া ফেলিয়াছি। ইতি

ম।"

এই ক্ষুদ্র প্রেমলিপি পাঠ করিয়া সে বুঝিল যে, না, এ কাগজ আমাকে লক্ষ্য করিয়া নিক্ষিপ্ত হয় নাই। আমাকে কে ভালবাসিবে? দারিদ্র্য নিষ্পেষিত আমাতে কি আছে, যে আমাকে দেখিয়া কোনও প্রেমিকার প্রেমলিপ্সা প্রবল হইয়া উঠিবে? হয়ত অন্য কোন পথিকের পরিবর্তে দৈবক্রমে উহা আমার গায়ে লাগিয়াছে। কিন্তু সবজজবাবুর বাটীতে কে এ প্রেমিকা, যে পথের পথিককে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছে? হয়ত কাগজ নিক্ষেপক স্ত্রী না হইয়া পুরুষ হইতে পারে; হয়ত, ঐ পুরুষ কোন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে পূর্বে এই ক্ষুদ্র প্রেমলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিল, এক্ষণে

অনাবশ্যক বোধে উহা পথে ফেলিয়া দিয়াছে; দৈবাৎ উহা আমার মস্তকের উপর পতিত হইয়াছে। কিন্তু সবজজবাবুর বাটীতে সবজজবাবু ব্যতীত অন্য পুরুষ কে আছে?

হেমেন্দ্রনাথ ভাবিল যে, সুকে জিজ্ঞাসা করিলে সবজজবাবুর বাটীর অনেক তথ্য জানিতে পারা যাইবে। অন্নপ্রাশনের দিন হেমেন্দ্রনাথ সবজজবাবুর বাটীতে একঘণ্টা মাত্র থাকিয়া আহার করিয়া আসিয়াছিল; কিন্তু সুলেখা বেলা তিনটার সময় যাইয়া, রাত্রি ১২টার সময় বাটীতে ফিরিয়াছিল, এবং স্ত্রীলোকগণের সহিত অবাধে কথোপকথন করিতে পারিয়াছিল। সুতরাং হয়ত সবজজ-বাবুর বাটীর অনেক তথ্যই সে অবগত হইয়াছে।

কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ সেই ক্ষুদ্র প্রেমপত্রটুকু তাহার স্ত্রীকে দেখা-ইতে পারে না; তাহার প্রাপ্তির কথা স্ত্রীর নিকট উল্লেখ করিতে পারে না; অন্যের গোপন প্রেমকাহিনী দৈবক্রমে জানিতে পারিয়া, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করা ভদ্রনীতির বিরুদ্ধ কার্য্য। আর হয়ত, সু তাহাকেই সেই প্রেমিকার প্রেমপাত্র মনে করিয়া, মিছামিছি একটা মনকষ্ট ভোগ করিবে। অতএব সে সেই প্রেম-লিপি কোনও গুপ্তস্থানে প্রচ্ছন্ন করিয়া ভিতর বাটীতে প্রবেশ করিল। কাগজটা ছিন্ন করিয়া রাস্তায় ফেলিয়া দিলেই ভাল হইত, কিন্তু হেমেন্দ্রনাথ তাহা করে নাই। সে মনে করিয়াছিল, কাগজটা হয়ত পরে কোনও রহস্য ভেদের সহায়তা করিতে পারে।

হেমেন্দ্রনাথ বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল, বারান্দার ধূলিকণা বিবর্জ্জিত মেঝের উপর পরিচ্ছন্ন কম্বলের আসনখানি

তাহার জন্য বিস্তৃত আছে; আসনের পুরোভাগে দর্পণের ন্যায় উজ্জ্বল স্থালীতে কয়েকখানি পরিপাটি পরোটা ও কিঞ্চিৎ চিনি সজ্জিত রহিয়াছে; আর নিকটে জলের কুঁজা ও পানপাত্র লইয়া সুহাসিনী সুলেখা হাস্যমুখে বসিয়া রহিয়াছে।

সুলেখা সহাস প্রচ্ছন্ন দৃষ্টি স্বামীর দিকে নিক্ষেপ করিল। দেখিল, স্বামীর ললাটে একটা দুশ্চিন্তা বিরাজ করিতেছে। দেখিয়া তাহার মনে একটু কষ্ট হইল; কিন্তু সে কোন কথা কহিল না।

হেমেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "মা কোথায়?"

সুলেখা বলিল, "মা উপরে আছেন; তাঁর শরীরটা আজ ভাল নেই।"

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, "দাঁড়াও, আগে মাকে দেখে আসি, তার পর জলখাবার খাব।" এই বলিয়া সে উপরে উঠিয়া মাতার অঙ্গ-স্পর্শ করিয়া দেখিল যে তাঁহার জ্বর হইয়াছে। দেখিয়া, তাহার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গেল। সে তাহার মাতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। মাতার সামান্য অসুখ হইলেই সে ভাবিয়া আকুল হইত; মনে করিত, বুঝি তিনি আর বাঁচিবেন না,—তাহাকে জন্মের মত মাতৃহীন করিয়া চলিয়া যাইবেন। নিম্নে নামিয়া, সে সুলেখাকে কহিল, "সু, মার খুব জ্বর হয়েছে; কি হবে?

সুলেখা বলিল, "তোমার কোনও ভাবনা নেই; মার জ্বর কাল সকালেই ছেড়ে যাবে।"

হেমেন্দ্রনাথ জলখাবার খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিল, "মাকে দেখবার জন্যে একজন ডাক্তার ডেকে আনব কি?"

সুলেখা বলিল, "কাল সকালে যদি জ্বর না ছাড়ে তা হলে ডাক্তার ডেকো; কিন্তু আমি বলছি, কাল সকালে মার জ্বর ছেড়ে যাবে।"

আজ জলযোগের পর হেমেন্দ্রনাথ বাহিরে বেড়াইতে গেল না; উপরে মাতার নিকট বসিয়া, তাঁহার মস্তকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। রাত্রি নয়টার পর হইতে মাতার জ্বর ক্রমশঃ কম পড়িতে লাগিল; তিনি কিছু উষ্ণ দুগ্ধ পান করিয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। তখন হেমেন্দ্রনাথ, ঝিকে মাতার নিকট বসাইয়া, নিম্নে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে বসিল।

আহার করিতে করিতে সে পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিল, "সু, তুমি বলতে পার, সবজজবাবুর বাড়ীতে সবজজবাবু ছাড়া অন্য কোন পুরুষ মানুষ আছেন কি না।"

সুলেখা এরূপ প্রশ্নের প্রত্যাশা করে নাই। সে মনে করিয়াছিল যে সবজজবাবুর বাড়ীতে অন্য কোন রমণী আছে কি না, স্বামী তাহাকে সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিবেন। সে বলিল, "না; আমি বেশ জানি, সবজজবাবুর বাড়ীতে সবজজবাবু ছাড়া, আর বামুন চাকর ছাড়া, অন্য কোন পুরুষ মানুষ থাকে না। কিন্তু সবজজবাবুর স্ত্রী ছাড়া, তাঁর বাড়ীতে একটি ভারি মজার মেয়েমানুষ আছে।"

হেমেন্দ্র। কি রকম?

সুলেখা। এমন সুন্দরী তুমি কখনও দেখ নি। তার নাম মনোরমা। মনোরমা ত মনোরমা; তার আশ্চর্য্য মুখ দেখলে সকলকেই মুগ্ধ হতে হয়। একে তেমন সুন্দর, তার উপর, তার পূর্ণ যৌবন; যেন রূপযৌবনের ভারে সে ঝলমল করছে।

হেমেন্দ্র। সে সবজজবাবুর কে?

সুলেখা। সে সবজজবাবুর কেউ নয়। সে সবজজবাবুর স্ত্রীর মাসীর মেয়ে—মাসতুতো বোন।

হেমেন্দ্র। সে এখানে থাকে কেন? তার কি বিয়ে হয় নি?

সুলেখা। সে আমার চেয়ে একবৎসরের ছোট;—তার আঠারো বছর বয়স, তার বিয়ে হয়েছে; কিন্তু সে স্বামীর ঘর করে না। স্বামী বড়লোক; স্বামীর স্বভাব চরিত্র ভাল নয়। মদ ও বদখেয়ালী নিয়ে থাকে; আবার মনোরমাকে অকারণ মারে। এমন সুরূপা স্ত্রীকে কোন্ প্রাণে মারে, অমন নরম গায়ে কেমন করে হাত তোলে, তা' ভগবান জানেন!

সুলেখা মনে করিয়াছিল যে প্রহারের কথা শুনিলে হেমেন্দ্র-নাথের মনে মনোরমার প্রতি করুণার উদয় হইবে; করুণা হইতে সহানুভূতি, এবং সহানুভূতি হইতে প্রেম সহজেই আসিয়া পড়িবে। সে স্বামীর মুখের দিকে একাগ্র দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু সেখানে করুণার কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। হেমেন্দ্রনাথ মুখের অন্ন গলাধঃকরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তা স্বামীর কাছে না থাকুক, বাপ মার কাছে থাকে না কেন?"

সুলেখা। বাপ মা কেউ বেঁচে নেই।

হেমেন্দ্র। বাপ না থাকুক; বাপের বাড়ী আছে ত!

সুলেখা। তাও নেই। মা আগেই মারা গিয়েছিল। বাপ, জামাইকে কুচরিত্র দেখে, মৃত্যুর আগে বাড়ী ঘর বিক্রি করে ঐ এক মেয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে গেছেন; মনোরমা সেই টাকা নিয়ে, বাপের মৃত্যুকালের অনুরোধ অনুযায়ী, সবজজ বাবুর সংসারে এসে মাস্‌তুতো বোনের কাছে বাস করছে। সবজজবাবু টাকাটা কোন ব্যাঙ্কে জমা রেখে দিয়েছেন; মনোরমা বছর বছর আড়াই হাজার টাকা হিসাবে সুদ পায়। ঐ সুদের টাকাতে গহনা গড়ায়, আর বাবুগিরি করে; কখন কখন দু এক শ টাকা দানও করে।

হেমেন্দ্র। তুমি তার চেহারার যেমন সুখ্যাতি করলে, তাতে মনে হয়, তোমাকেও দুই এক শ টাকা দান করেছে।

সুলেখা। শোন, মনোরমা তোমাকে চেনে। আর সে তোমার চেহারার যেমন সুখ্যাতি করলে, তাতে মনে হয়, তুমিই তাকে দুই এক শ' টাকা দান করেছ।

হেমেন্দ্র। কি রকমে চিনলে?

সুলেখা। তা বলতে পারি নে। কিন্তু আমি যখন তোমার পরিচয় দিতে গেলাম, সে বললে, ওঃ পেস্কার বাবু ত? হেমেন্দ্র বাবু ত? আমি তাঁকে খুব চিনি; তিনি এই পথ দিয়ে রোজ কাছারি যান, আবার এই পথ দিয়ে বাড়ী ফেরেন, আমি তাঁকে দু'বেলা দেখি। অমন ভাল চেহারা ত সব সময় দেখতে পাওয়া যায় না, তাই দেখি। দেখি, তাঁর মাথায় কালো টুপি, গায়ে

কালো চাপকান, পরণে সাদা পায়জামা, পায়ে ক্যাম্বিসের বুট, কপালে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখে সোণার চশমা, ফর্সা রং, দাড়িগোঁফ কামান—সর্ব্বদাই যেন কি ভাবতে ভাবতে রাস্তা চলেন।"

হেমেন্দ্র। ওঃ! তা হলে, সত্যিই ত আমাকে চেনে।

সুলেখা ভাবিয়াছিল, স্বামীর নিকট মনোরমার যে মধুর চিত্র চিত্রিত করিল, তাহা চিন্তা করিতে করিতে হেমেন্দ্রনাথ, সারারাত অনিদ্রায় অতিবাহিত করিবে; কিন্তু আহারাদির পর, সে শয্যা-গৃহে যাইয়া দেখিল স্বামী গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত রহিয়াছেন। দেখিয়া সে নিদ্রিত স্বামীর মুখচুম্বন করিয়া আপন মনে কহিল, "প্রাণাধিক! আমার প্রতি তোমার অগাধ প্রেম যেন চিরদিন এইরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে। মনোরমার মধুর আহ্বানে তুমি কর্ণপাত করিয়াছ, ইহা যেন কেহ কখন না বলিতে পারে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

চিকিৎসার ব্যয়

হেমেন্দ্রনাথ সকালে উঠিয়া দেখিল, তাহার মাতার জ্বর সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ হইয়াছে। সে হৃষ্টমনে তাঁহার পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া, এবং নিজের স্নানাহার সমাধা করিয়া আদালতে গেল।

বিকালে বাটী প্রত্যাগমনের সময় তাহার গাত্রে প্রেম বৃক্ষের

পুষ্পের ন্যায় পুনরায় ক্ষুদ্র কাগজের গোলক পতিত হইল। সে উপরে চাহিয়া দেখিল, সবজজবাবুর বাটীর দ্বিতলের এক গবাক্ষ হইতে এক রত্নালঙ্কারভূষিতা যুবতী অন্তর্হিতা হইতেছে। তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না যে, এই রত্নালঙ্কারময়ীই মনোরমা; কিন্তু সে মনোরমার সুন্দর মুখ দেখিতে পায় নাই।

হেমেন্দ্রনাথ কাগজখণ্ড উঠাইয়া, তাহাতে নিম্নলিখিত লিখন পাঠ করিল।—

"জীবনসর্ব্বস্ব!

এস, এস, এস; আসিয়া আমার সর্ব্বস্ব গ্রহণ কর। আমার নির্ম্মল প্রেম-নদীতে আসিয়া অবগাহন কর;—আমার অসীম ভালবাসায় তোমার হৃদয় কাণায় কাণায় পূর্ণ করিয়া দিব; এস।

আমার জানালার দিকে তাকাইয়া দেখ। দেখিবে উহা হইতে একটি সরু কালো সূতা রাস্তায় লম্বিত রহিয়াছে। এই পত্রের উত্তর একটুক্রা কাগজে লিখিয়া, তাহা ঐ সূতায় বাঁধিয়া দিও; আমি তুলিয়া লইব।

এক ছত্র লিখিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিও।" ইতি—

তোমার প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী

"ম।"

পত্র পাঠ করিয়া হেমেন্দ্রনাথ আবার গবাক্ষের দিকে বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। দেখিল, যে একটি কালো রেশমের অতি সূক্ষ্ম সূত্র প্রায় অদৃশ্যভাবে রাস্তা পর্য্যন্ত লম্বিত রহিয়াছে।

হেমেন্দ্রনাথ স্থির করিল যে আজও এই পত্র 'সু'কে দেখান হইবে না। এ পত্র দেখিলে হয়ত তাহার মনে সন্দেহের বীজ উপ্ত হইবে; তাহাতে তাহার মনের শান্তি নষ্ট হইবে। কেন বেচারাকে সে অকারণ কষ্ট দিবে? সে বাটী যাইয়া পত্রখানি পূর্ব্বোক্ত গুপ্ত স্থানে লুকাইয়া রাখিল। পরে জলযোগ করিয়া, মাতাকে দেখিবার জন্য উপরে গেল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ মা?"

মাতা শীতে জড় সড় হইয়া বলিলেন, "এতক্ষণ ত বেশ ভাল ছিলাম, কিন্তু এখন একটু একটু শীত করছে; বোধ হয় জ্বর আসবে।"

হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে বিছানায় উঠাইয়া শোয়াইল; মোটা গাত্রাবরণ আনিয়া, তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। রাত্রি আটটার সময় মাতার জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, মাতা যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলেন। হেমেন্দ্রনাথ তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাহা অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত। সে ভীত হইয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার ঔষধ লিখিয়া দিলেন। হেমেন্দ্র ঔষধালয় হইতে ঔষধ লইয়া আসিল। সুলেখাকে লইয়া, সারারাত জাগিয়া মাতার শুশ্রূষা করিল।

ঔষধ ও শুশ্রূষার গুণে নিশাবসানে মাতার জ্বরের উত্তাপ কিছু কম পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু বেলা আটটার সময় জ্বরের উপর আবার জ্বর আসিল। তাহা দেখিয়া ডাক্তার ললাট কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "বোধ হয়, ব্যায়ামটা কিছু শক্ত হয়ে দাঁড়াবে।"

হেমেন্দ্রনাথ মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি অন্য কোনও ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করবেন কি ?"

ডাক্তার বলিলেন, "আর কার পরামর্শ গ্রহণ করব ? তবে আজ বিকালে যদি একবার সিবিল সার্জ্জনকে ডাকেন, তা হলে তাঁর নিকট কিছু পরামর্শ গ্রহণ করি।"

হেমেন্দ্রনাথ তাহাই করিল। একদিন অন্তর সিভিল সার্জ্জন আসিতে লাগিলেন। ডাক্তার দুই বেলা আসিতে লাগিলেন। সুলেখা রীতিমত পথ্যের ব্যবস্থা করিল। হেমেন্দ্রনাথ যতক্ষণ বাটীতে থাকিত, ততক্ষণ একবারও মাতার শয্যাপার্শ্ব ত্যাগ করিত না। অকাতর পরিশ্রম ও অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া, সে মাতাকে রক্ষা করিবার জন্য দশদিন মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ করিল। একাদশ দিবসে মাতা সুস্থ হইলেন।

চতুর্দ্দশ দিবসে মাতা অন্নাহার করিলেন। বাটীতে আবার শান্তি বিরাজ করিল, আবার সুশৃঙ্খলায় সংসার চলিতে লাগিল।

সবজজ বাবুর বাটীর সেই গবাক্ষ হইতে প্রেমের সেই সূক্ষ্ম সূত্রটি ঝুলিতেছে কি না, বা গাত্রে কোন প্রেমপত্র পতিত হইল কি না, এতদিন তাহা লক্ষ্য করিবার ক্ষমতা হেমেন্দ্রনাথের ছিল না। সে অত্যন্ত তাড়াতাড়ি আহার করিয়া দ্রুতবেগে আদালতে যাইত; এবং বিকালে আদালত হইতে দ্রুতবেগে বাটীতে প্রত্যাগত হইত। এক্ষণে তাহার মাতা সুস্থা হইলে, সে আবার একদিন পূর্ব্বোক্ত প্রকার প্রেমপত্র পাইল। তাহাতে লেখা ছিল—

"প্রাণাধিক!

আজ সকালে যখন তুমি আদালতে যাইতেছিলে, তখন অনেক দিন পরে তোমার হর্ষমুখ দেখিয়া আমার ভারি আহ্লাদ হইল। এতদিন রোজ রোজ তোমাকে বিষণ্ণ দেখিতাম কেন? জীবন-সর্ব্বস্ব, আমাকে তাহা বলিবে না কি? দয়া করিয়া আমাকে একটু পত্র লিখিও; দেখ, তোমার পত্রের আশায় সূতাটি রাত্রিদিন রাস্তায় ঝুলিয়া আছে।

"যদি পত্র না লিখিয়া আমার সহিত তোমার সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে তোমাদের বাড়ীর পশ্চাতের আমবাগানে আসিও; সেখানে প্রত্যহ রাত্রি আটটার সময় আমাকে দেখিতে পাইবে। দয়া করিয়া আসিও, আসিও।

প্রেমতৃষ্ণাতুরা

ম।

হেমেন্দ্রনাথ পূর্ব্ব দুই পত্রের ন্যায় এই পত্রও গুপ্ত স্থানে লুকাইত রাখিল। কিন্তু সে আজ স্থির করিয়াছিল যে, এই পত্রের উত্তর দিবে। পত্র লিখিয়া, স্ত্রীলোকটির এইরূপ প্রেমপত্র লেখা বন্ধ করিয়া দিবে। লিখিবে যে, কুলনারীর পক্ষে এইরূপ পত্র লেখা অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য। লিখিবে যে, সে কখন চরিত্র-হীন হইয়া কুলনারীর সর্ব্বনাশ করিতে পারিবে না।—না, মনোরমার ন্যায় শ্রেষ্ঠ রূপসীও তাহার সমস্ত ঐশ্বর্য্য লইয়া হেমেন্দ্রনাথকে ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না।

এইরূপ সঙ্কল্পানুযায়ী একখানি ক্ষুদ্র পত্র লিখিয়া, সন্ধ্যার অন্ধকারে হেমেন্দ্রনাথ উহা সূত্রে বাঁধিয়া দিয়া আসিল।

রাত্রে স্বামীর পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে সুলেখা জিজ্ঞাসা করিল, "মার অসুখে যে টাকা খরচ হল, তা কি তোমার কাছে ছিল?"

হেমেন্দ্র। তুমি ত জান সু, আমার কাছে দুশ টাকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না; কিন্তু ডাক্তারে ও ঔষধে প্রায় সাড়ে তিন শ' টাকা খরচ হয়েছে।

সুলেখা। বাকী দেড়শ' টাকা তুমি কোথায় পেলে?

হেমেন্দ্র। এই দেড়শ টাকার মধ্যে পঞ্চাশ টাকা এখনও দোকানে ধার আছে। মুদীর দোকানের ঋণ আর ঔষধের ঋণ এখনও সব পরিশোধ করা হয় নি।

সুলেখা। বাকী একশ' টাকা?

হেমেন্দ্র। আদালত সংক্রান্ত কিছু টাকা আমার কাছে আনামত ছিল, তা থেকে একশ টাকা খরচ করেছি।

সুলেখা এই টাকা কবে পূরণ করতে হবে।

হেমেন্দ্র। যে টাকা আমাদের হাতে আসে তা টাকাপ্রাপ্তির দিনেই ট্রেজারিতে জমা দেবার নিয়ম। কিন্তু দু একদিন বিলম্ব হলেও ক্ষতি হয় না।

সুলেখা। কিন্তু এই টাকা জমা দিতে ত বিলম্ব হবে। তার আগে জদি জানাজানি হয়ে যায়?

হেমেন্দ্র। তা হলে ভয়ানক বিপদ; হয়ত জেলে যেতে হবে।

সুলেখা। তবে কেন সে টাকা নিলে?

হেমেন্দ্র। আমার মার জীবন আগে, না আমার জেলে যাবার ভয় আগে? মার জীবন রক্ষা করবার জন্যে কত ছেলে জীবন বিসর্জ্জন করে; আমি না হয় দু'মাস জেলে যাব। আর জেলেই বা যাব কেন? কোন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে টাকাটা ধার করে তহবিল পূরণ করব। তার পর মাহিনার টাকা থেকে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ করব।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সেরেস্তাদারের রাগ

হেমেন্দ্রনাথ ভুল বুঝিয়াছিল। সে দুই তিন দিবস তাহার বন্ধু বান্ধবের দ্বারে দ্বারে ঘুরিল, একটি কপর্দ্দকও সংগ্রহ করিতে পারিল না; সকলেই আপন আপন মহা অর্থাভাবের কথা জানাইল। হেমেন্দ্রনাথ মহা সমস্যায় পড়িল; সে কি করিবে? দুই এক দিন মধ্যে টাকা জমা দিতে না পারিলে, সে অপরাধী বলিয়া ধরা পড়িবে; তাহার চাকুরী যাইবে; এবং তহবিল তস্রূপাতের অপরাধে তাহাকে কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে। এই বিপদের কথা চিন্তা করিতে করিতে সে অবসন্ন হইয়া পড়িল। সে বিষণ্ণ মনে আফিসে যাইত, বিষণ্ণ মনে আফিস হইতে বাটীতে ফিরিত। সে রাত্রে জাগিয়া ভাবিত, তাহার কারাদণ্ড হইলে, তাহার

স্নেহময়ী মাতার দশা কি হইবে, প্রেমময়ী সুলেখা কিরূপেই বা জীবন ধারণ করিবে? তাহারা কি খাইবে? কোথায় আশ্রয় পাইবে? তাহার কারাদণ্ডে মহা অপমানে হয়ত তাহারা বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিবে।

শনিবার দিন আফিস যাইয়া হেমেন্দ্রনাথ ভাবিল যে, আর দুই একদিন এই ব্যাপারটা অবিদিত থাকিলে আগামী মঙ্গলবার দিন সে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে। মঙ্গলবার মাসের প্রথম দিন; ঐ দিন সে সত্তর টাকা বেতন পাইবে; আর ত্রিশ টাকা সে সহজেই দুই তিন জন বন্ধুর নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে পারিবে।

কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের আশা পূর্ণ হইল না। দুই দণ্ড যাইতে সেরেস্তাদার তাহাকে নিভৃতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নিকট যে সকল অমানতি টাকা ছিল, তা কি আপনি নিয়মিত ভাবে ট্রেজারিতে জমা দিয়েছেন?"

হেমেন্দ্রনাথের মুখ শুকাইয়া গেল, বুকের মধ্যে কম্পন উপস্থিত হইল। কিন্তু সে স্থির করিয়া লইল যে একটিও মিথ্যা কথা বলিবে না। সে বলিল, "না, মশাই সকল টাকা জমা দেওয়া হয়নি।"

সেরেস্তাদারবাবু বলিলেন, "কাগজ দেখে বুঝলাম, এই মাসে আটশ টাকা আপনার কাছে আমানত ছিল। এর মধ্যে কত টাকা জমা দেওয়া হয় নি?"

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, "প্রায় একশত টাকা।"

সেরেস্তাদার বাবু বলিলেন, "এটা আর ফেলে রাখবেন না। আগামী সোমবারে মাস কাবার; ঐ দিনই টাকাটা জমা দেবেন।"

হেমেন্দ্রনাথ মিনতির স্বরে কহিল, "মহাশয়, আপনি যদি আমার একটু উপকার করেন।"

সেরেস্তাদার বাবু বিস্মিতের ভাব দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ?"

হেমেন্দ্রনাথ কহিল, "আগামী মঙ্গলবার মাসের প্রথম তারিখ, ঐদিন আমরা বেতন পাব। তাতে আমার সত্তর টাকা হবে। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করে ঐদিন আমাকে ত্রিশটি টাকা ধার দেন; তা হলেই আগামী মঙ্গলবার আমি ঐ একশ টাকা জমা দিতে পারব। আগামী সোমবারে কোনক্রমেই টাকা জমা দিতে পারব না; কারণ টাকা এখন আমার কাছে নেই।"

সেরেস্তাদার বাবু মহারাগান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি! সরকারি টাকা আপনি খরচ করেছেন নাকি? কি সর্ব্বনাশ! আপনাকে ত সৎলোক বলে জানতাম। এই কলিকালে মানুষ চেনা বড় কঠিন কায। সোমবারে যেমন করে হোক, টাকাটা জমা দিতে পারেন ভালই, নয়ত অগত্যা সাহেবকে রিপোর্ট করতে বাধ্য হব। সাহেব যে আপনার ভারি সুখ্যাত করেন, এইবার আপনার গুণপনা জানতে পারবেন। আপনি মঙ্গলবারে বেতন পাবার কথা বলছেন; কিন্তু আপনার কাছ থেকে প্রাপ্য টাকাটা আপনি যতক্ষণ না জমা দেন, ততক্ষণ আপনার বেতন আটক থাকবে।

আর অপনাকে কিছু ঋণ দেবার কথা বলছেন ; তা বন্ধু বান্ধব বিপদে পড়লে, এরূপ ঋণ দেওয়া উচিত বটে। কিন্তু আপনার বুদ্ধি আছে ত, আপনি বেশ বুঝছেন যে এখন আপনাকে কোন টাকা ঋণ দিলে তাহা আর ফিরে পাবার আশা নেই,—টাকাটা জলে ফেলে দেওয়া হবে।"

হেমেন্দ্রনাথ সেরেস্তাদার বাবুর বাক্যের কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিল না ; কিছুক্ষণ মৌন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহা দেখিয়া সেরেস্তাদার বাবু বলিলেন, "যান, আপনার কাযকর্ম্ম করুন ; এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকলে কি হবে ? কিন্তু জেনে রাখবেন যে, সোমবারে টাকা জমা দিতে না পারলে একটা মহা কেলেঙ্কারী হবে।"

হেমেন্দ্রনাথ বাহিরে আসিয়া, অপমানে ও দুঃখে কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু সে স্থির করিল যে তাহার এই মহা বিপদের কথা, তাহার মাতাকে বা পত্নীকে বলিবে না।—কেন তাহা-দিগকে দুই দিন আগে মনকষ্ট প্রদান করিবে ?

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দুই শত টাকা

অপরাহ্ণে বাটী ফিরিবার সময়, হেমেন্দ্রনাথ উদাস নেত্রে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল। হঠাৎ সবজজবাবুর বাটীর সেই গবাক্ষে তাহার দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিল, আজ তাহা

সম্পূর্ণ উন্মুক্ত ; সেখানে রত্নালঙ্কার ভূষিতা হইয়া, অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া এক যুবতী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখিয়া সে চক্ষু অবনত করিয়া চলিল। আবার কেন? সেই নিষেধপত্র লিখনের পর, মনোরমা ত পাঁচ ছয়দিন আর কোন প্রেমপত্র নিক্ষেপ করে নাই। এতদিন পরে আবার কেন সে এই গবাক্ষের নিকট আসিল? তাহার প্রেমরোগ আবার কি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে? আজ কি আবার সে পত্র নিক্ষেপ করিবে? কিন্তু না, আজ সে পত্র নিক্ষেপ করিল না। হেমেন্দ্রনাথ গবাক্ষের নিম্ন দিয়া নির্ব্বিঘ্নে চলিয়া গেল ; কাগজের গোলক তাহার গাত্রে পতিত হইল না।

হেমেন্দ্রনাথ বাটী ফিরিল। বাহিরের ক্ষুদ্র ঘরটিতে তক্তপোষের উপর একখানি মাদুর বিছান ছিল। সেই মাদুরের উপর বসিয়া সে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিত। আজ বস্ত্র পরিবর্ত্তন জন্য সেই মাদুরে বসিতে যাইয়া দেখিল, জানালার নীচে একখানা পত্র পড়িয়া রহিয়াছে ; কেহ খোলা জানালা দিয়া তক্তপোষের উপর তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। সে পত্র খানা উঠাইয়া লইল ;—পত্রের আবরণে তাহারই নাম লেখা রহিয়াছে। পত্র খানা ডাকে আসে নাই ; তাহাতে ডাকঘরের ছাপ বা টিকিট লাগান ছিল না। পত্রের ঠিকানাটা বাঙ্গালায় লেখা,—কাহার হস্তাক্ষর? হেমেন্দ্রনাথ চমকাইয়া উঠিল, —এ যে মনোরমার হস্তাক্ষর! পত্রখানা এত ভারি কেন? এত বড় পত্রে সে তাহাকে কি লিখিয়াছে? হায় হায়, অভাগিনীর প্রণয়াবেগ ত প্রশমিত হয় নাই!

হেমেন্দ্রনাথ পত্রের আবরণ খুলিয়া ফেলিল। বিস্মিত হইয়া

দেখিল, যে ভিতরে কেবল মাত্র পত্র নহে, কতকগুলি নোটও রহিয়াছে। সে নোট গণিয়া দেখিল—কুড়িখানি দশ টাকার নোট,—দুইশত টাকা। হেমেন্দ্রনাথ ভাবিল, এইরূপ অর্থ পাঠাইবার কারণ কি? মনোরমা কি তাহার অর্থাভাবের কথা জানিতে পারিয়াছে? তাই দানশীলা তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য এই অর্থ পাঠাইয়াছে? এই টাকা গ্রহণ করিলে সে অনায়াসে সোমবারে একশত টাকা জমা দিয়া, মহা বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে; ইহা ছাড়া ঔষধের দোকানের ঋণ ও অন্যান্য সমুদয় ঋণ পরিশোধ করিতে পারিবে।

ঐ নোটগুলির সহিত মনোরমার স্বহস্ত লিখিত একখানা প্রেমলিপি ছিল। হেমেন্দ্রনাথ তাহা পাঠ করিল—

"প্রাণাধিক প্রাণ,

"তুমি আমাকে পত্র লিখিতে বারণ করিয়াছিলে। আমিও মনে করিয়াছিলাম যে আমার প্রাণাধিকের আজ্ঞা কখনও লঙ্ঘন করিব না,—আর কখন তোমাকে পত্র লিখিব না। মনে করিয়াছিলাম যে কেবল জানালা হইতে তোমাকে দেখিব; দুই বেলা দেখিব; চোখের দেখা দেখিয়া এই উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে শান্ত করিব। কিন্তু কয়েকদিন হইতে তোমার বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া, আর স্থির থাকিতে পারিলাম না; অস্থির চিত্তবেগে আমার সমস্ত সঙ্কল্প ভাসিয়া গেল; আমি আবার তোমায় পত্র লিখিতে বসিলাম, ইহাতে দাসীর যে অপরাধ হইল, তাহা ক্ষমা করিও।

"তোমার কি হইয়াছে, আমাকে বলিবে না কি? আমার

ঝি তোমাদের ঝির মুখে শুনিয়াছে যে মার অসুখ হইয়াছিল; তাহার জন্য তোমার অনেক টাকা খরচ হইয়াছে। আমাকে এই খরচের কিছু ভাগ লইতে দাও।

"আজ রাত্রি আটটার সময় আমি বাগানে থাকিব, তুমি আসিও। আসিয়া আমাকে তোমার বিষাদের কারণ কি বলিও। আসিও; রাত্রি আটটা হইতে আমি সারা রাত তোমার জন্য বাগানে ঘুরিয়া বেড়াইব।

"তোমার প্রেমোন্মাদিনী
'ম'।"

ঐ প্রেমলিপি পাঠ করিয়া সে কিছুক্ষণ চিন্তা করিল। সেই অভাবের সময় টাকাটা গ্রহণ করিবার জন্য, হেমেন্দ্রনাথের মন একবার বিচলিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আপনাকে শাসিত করিল। ভাবিল যে না, এ অর্থ গ্রহণ করা হইবে না; ইহা আজই প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। এই অর্থ গ্রহণ করিয়া সে আপনাকে কখন কলুষিত হইতে দিবে না; তাহার পর তাহার অদৃষ্টে ভগবান যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হইবে। ইহা স্থির করিয়া, সে পত্রখানি ও নোটগুলি আবরণ মধ্যে পূরিয়া উহা পূর্ব্বোক্ত গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিল।

সে চিন্তিত মনে বাটীর ভিতর আসিয়া দেখিল যে সুলেখা তাহার জলখাবারের কাছে বসিয়া, দক্ষিণ হস্তের দ্বারা বাম হস্তের কৃষ্ণকাচ নির্ম্মিত চুড়িগুলি আস্তে আস্তে ঘুরাইতেছে;—

করপদ্মের কোলে তাহা যেন ভ্রমর-পংক্তির ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে।

জলখাবার খাইতে খাইতে হেমেন্দ্রনাথ সুলেখাকে জিজ্ঞাসা করিল, "সু, বল দেখি, তোমার স্বামী কখন কু হতে পারে কি না।"

সুলেখা বলিল, "না। আমি আমার স্বামীকে খুব চিনি—আমার স্বামী কখন কু হতে পারে না।"

হেমেন্দ্রনাথ বলিল, "না, আমি কখনই কু হব না। জেলে যাব, তবু কু হব না।"

সুলেখা বলিল, "তোমাকে জেলেও যেতে হবে না, কুও হতে হবে না।"

হেমেন্দ্রনাথ ভাবিল, আমার বিপদটা যে কত ভয়ানক, তাহা সুলেখা এখনও কিছুই বুঝিতে পারে নাই। আমার বিপদের কথা জানিতে পারিলে, সুলেখার মনে একটুও শান্তি থাকিবে না। যতক্ষণ পারি উহাকে তাহা জানিতে দিব না। তাহার পর যাহা হয় হইবে। সে প্রকাশ্যে বলিল, "না, কু হব না এটা নিশ্চয়।"

জলযোগের পর, সে মনোরমার পত্র ও নোটগুলি লইয়া রাস্তায় বাহির হইল। মনে করিয়াছিল, সবজজ বাবুর বাটীর গবাক্ষতলে যাইয়া, সেই দোদুল্যমান প্রেমসূত্রে উহা বাঁধিয়া দিবে, তাহা হইলে মনোরমা উহা তাহার প্রেমপত্রের প্রত্যুত্তর মনে করিয়া তুলিয়া লইবে; সে নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিবে, উহা ঠিক মনোরমার হস্তগত হইল কি না। কিন্তু সে গবাক্ষের নিকটে যাইয়া দেখিল

যে আজ কোনও সূত্র লম্বিত নাই। তবে কিরূপে সে মনোরমার অর্থ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবে? সে কি ডাকযোগে উহা মনোরমার নিকট পাঠাইয়া দিবে? কিন্তু তাহা অন্য লোকের হাতে পড়িলে একটা জানাজানি ঘটিবার বিলক্ষণ আশঙ্কা আছে। তাহাদের পরিচারিকার দ্বারা উহা মনোরমার নিকট পাঠান চলে না; সবজজবাবুর গৃহিণী তাহাকে নানারূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়া ছাড়িয়া দিবেন না; আবার সে যদি বাড়ীতে কোনও কথা বলিয়া ফেলে, সুলেখার মনেও সন্দেহের উদয় হইবে। অতএব পরিচারিকাকে পাঠানও যুক্তিযুক্ত নয়।

অনেক চিন্তার পর হেমেন্দ্রনাথ স্থির করিল যে রাত্রি আটটার সময় আমবাগানে যাইয়া, অর্থ ও পত্র মনোরমাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে; ইহা ছাড়া আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু সুলেখার অগোচরে—খুব গোপনে—বাগানে যাইতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পরীক্ষার ফল

খিড়কী দরজার চাবি খিড়কী দরজার নিকট একটা গজালে টাঙ্গান থাকিত। ঐ চাবি দিয়া চুপি চুপি দরজা খুলিয়া রাত্রি আটটার কিছু পূর্ব্বে হেমেন্দ্রনাথ অত্যন্ত গোপনে বাগানে প্রবেশ করিল। সেদিন বাগানটি চন্দ্রালোকে আলোকিত ছিল। বাগান

অপরিচ্ছন্ন ও কণ্টকপুঞ্জে পূর্ণ থাকিলেও জ্যোৎস্নালোকে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল। মনে হইতেছিল কে যেন অতি সূক্ষ্ম সুবর্ণের আবরণে অপরিচ্ছন্ন আগাছাগুলিকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে; কে যেন আমগাছগুলিকে সুবর্ণের অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া দিয়াছে। বাগানের এক পার্শ্বে একটা পুষ্করিণী ছিল; তাহার জলে, চন্দ্র ও নক্ষত্রদল সহ নীল আকাশ প্রতিবিম্বিত হওয়ায়, পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্বর্গের সৃষ্টি হইয়াছিল। কোনও কোনও বিহঙ্গম উজ্জ্বল চন্দ্রালোককে প্রভাতালোক মনে করিয়া, ভ্রমবশতঃ এক একবার ডাকিয়া উঠিতেছিল। বাগানের দক্ষিণদিকের গৃহগুলি চন্দ্রালোকে রজত নির্ম্মিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

সময় ও স্থান দুইই প্রেম সম্ভাষণের উপযুক্ত ছিল; কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রেম ছিল না। সে কর্ত্তব্য পালন করিতে আসিয়াছিল।

হেমেন্দ্রনাথ বাগানের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল; কিন্তু কোথাও জনমানব দেখিতে পাইল না। সে মনে করিল, বোধ হয় অনেকটা আগে আসিয়াছে; এখনও মনোরমার আসিবার সময় হয় নাই, এখনও হয়ত আটটা বাজে নাই; কিংবা হয়ত সে বাগানের অন্য দিকে কোনও ঝোপের আড়ালে অবস্থিতি করিতেছে।

মনোরমার সন্ধানে চারিদিক ভ্রমণ করিতে করিতে হঠাৎ হেমেন্দ্রনাথের মনে একটা আশঙ্কার উদয় হইল। এই চন্দ্রালোকিত নিশীথে, এই নির্জ্জন স্থানে একজন প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী

যুবতীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করা কি তাহার পক্ষে উচিত কার্য্য হইবে? যদি ঘুণাক্ষরেও একথা কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে—সে আপনার দুর্ণামের ভয় করে না—কিন্তু একজন ভদ্র-ঘরের মেয়ে জনসমাজে অকারণ চিরকলঙ্কিনী হইয়া থাকিবে। আরও ভয় আছে! তাহাকে বাগানে দেখিয়া যদি মনোরমা মনে করে যে, সে তাহার প্রার্থনা পূরণ জন্যই আসিয়াছে; এবং ইহা মনে করিয়া যদি সেই উন্মাদিনী সহসা হেমেন্দ্রনাথকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলে! ছি ছি! তাহা হইলে কি লজ্জাকর ব্যাপারই অভিনীত হইয়া যাইবে!

না, অর্থ প্রত্যর্পণের জন্য হেমেন্দ্রনাথের বাগানে আসা ভাল হয় নাই; পরে অন্য কোনও উপায়ে উহা প্রত্যর্পণ করিলেই চলিত। সে ভাবিল, এখনও সময় আছে; মনোরমা বাগানে আসিতে না আসিতে আমি বাটী ফিরিয়া যাই।

বাটীর দিকে সে একপদ অগ্রসর হইতে না হইতে এক অব-গুণ্ঠনবতী শ্বেতবসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া তাহার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল; এবং তাহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইবার পূর্ব্বেই রত্নালঙ্কৃত বামহস্তটি বসনাবরণ হইতে বাহির করিয়া তদ্দ্বারা হেমেন্দ্রনাথের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল। একটা বিদ্যুৎ প্রবাহ হেমেন্দ্রনাথের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইল। কিন্তু পর-মুহূর্ত্তে সে আপনাকে সংযত করিয়া লইল। মনোরমার উজ্জ্বল অলঙ্কার-ময় ও মধুর প্রেমময় হস্ত মুক্ত করিয়া সে দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "আপনি ভুল করেছেন। আমি সম্পূর্ণ



ভিন্ন উদ্দেশ্যে এই বাগানে আপনার সহিত সাক্ষাতের ইচ্ছা করেছিলাম। আপনি আমাকে এ পর্য্যন্ত যতগুলি চিঠি লিখেছেন, এবং আজ যে অর্থ পাঠিয়েছেন, আপনাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যেই আমি আজ আপনার কাছে এসেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম, জানালা থেকে ফেলা সেই সূতার সাহায্যে এগুলি আপনার কাছে পাঠাব; কিন্তু আজ আপনি সূতা ফেলে রাখেন নি, সুতরাং আমি এই বাগানে আসতে বাধ্য হয়েছি। এই নিন আপনার নোট, আর সব চিঠি। আপনি আর কখন আমাকে চিঠি লিখবেন না, বা টাকা পাঠাবেন না। এতে আপনার এবং আমার উভয়েরই মহা অনিষ্ট হবে। এটা পাপ; কারও আচরণীয় নয়।"—এই বলিয়া হেমেন্দ্রনাথ বাটীর দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইল।

যুবতী ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে বাহুবন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল; বলিল, "আমাকে একলা ফেলে কোথায় যাও?"

হেমেন্দ্রনাথ চমকিয়া উঠিল। একি! এ যে চিরপরিচিত কণ্ঠস্বর। সে একমুহূর্ত্তে সুলেখাকে চিনিয়া ফেলিল; জিজ্ঞাসা করিল, "সু—সু! তুমি এখানে কেমন করে এলে?"

সুলেখা কহিল, "যেমন করে তুমি এলে, আমিও তেমনই করে এলাম—ঐ খিড়কীর দরজা দিয়ে।"

হেমেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কেমন করে জানলে যে এখানে এই সময় আমার সঙ্গে দেখা হবে।"

সুলেখা বলিল, "শোন, বলি! এতদিন তোমায় বলি নি।

আজ তুমি প্রণয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ, আজ তোমায় সকল কথা বলব। ঐ সবজজ বাবুর স্ত্রী আমার বাল্যসখী; খুব অল্পবয়স থেকে ওর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। সেই অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে গিয়ে আমি জানতে পারলাম যে সে সবজজ বাবুর গৃহিণী হয়ে আমার নিকটেই বাস করছে। সেই অবধি সে রোজ এই বাগানের পথে আমাদের বাড়ীতে আসে। আমিও প্রায় রোজ তাদের বাড়ীতে যাই। আমার প্রতি তোমার প্রণয়টা কত গভীর তা পরীক্ষা করবার জন্যে, তাতে আমাতে পরামর্শ করলাম। সে আমাকে একটা কৌশল বলে দিল; আমি ফাঁদ পাতলাম; তোমার কাছে মনোরমার গল্প বললাম; বাঁহাতে চিঠি লিখে তোমার গায়ে ছুড়ে দিলাম; গহনা পরে জানালা খুলে তোমার সম্মুখে দাঁড়ালাম; তোমার ভয়ানক অভাবের সময় তোমাকে টাকা পাঠালাম; কিন্তু কিছুতেই তোমার মন মজাতে পারলাম না। তুমি অনায়াসে প্রণয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে।"

হেমেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এত গহনা, আর দু শ টাকা কোথায় পেলে? আর আমি বাড়ী ফিরে দেখতাম যে তুমি আমার জলখাবার সাজিয়ে বসে রয়েছে; তবে তুমি কেমন করে সবজজ বাবুর বাড়ী থেকে আমার গায়ে চিঠি ফেলতে?"

সুলেখা বলিল, "গহনা সবজজ বাবুর স্ত্রীর; এই প্রণয় পরীক্ষা উপলক্ষে সে আমাকে পরতে দিয়েছিল। টাকাটা তার কাছ থেকে তোমার জন্যে ধার নিয়েছি; মাসে মাসে দশ টাকা হিসাবে শোধ দিতে হবে। আর বাগানের পথ দিয়ে গেলে, সব

জজ বাবুর বাড়ী খুব কাছে হয়। তাই, আমি তোমার আগে বাড়ী ফিরে, গহনা খুলে, তোমার জলখাবারের কাছে বসতে পারতাম।

হেমেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিল, "তা হলে এর মধ্যে মনোরমা কেউ নেই?"

সুলেখা বলিল, "কেন থাকবে না? দেখ না, আমিই তোমার মনোরমা।"—এই বলিয়া সে তাহার সুন্দর মুখ হেমেন্দ্রনাথের মুখের নিকট তুলিয়া ধরিল। তাহাতে অত্যুজ্জ্বল চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় তাহা এক স্বর্গীয় প্রভায় প্রভান্বিত হইয়া উঠিল।

হর্ষোৎফুল্ল নয়নে তাহা নিরীক্ষণ করিয়া হেমেন্দ্রনাথ বলিল, "হ্যাঁ, তুমি সত্যই আমার মনোরমা।"

ভ্রান্তির পরিণাম

প্রথম পরিচ্ছেদ

ভোলানাথ দত্তের ভুল।

বিবাহের পরদিন হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া দেখা গেল যে, আমরা যে গাড়ীতে মগড়ায় যাইব মনে করিয়াছিলাম, তাহা অর্দ্ধ ঘণ্টা আগে চলিয়া গিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, ইহার পরে মগরা যাইতে হইলে, লুপ্‌ প্যাসেঞ্জার ছাড়া আর কোনও গাড়ী যাইবে না। ঐ গাড়ী হাওড়া হইতে রাত্রি দেড়টার সময় ছাড়িবে। বাবা বলিলেন যে সেই গাড়ীতেই যাইবেন; যেমন করিয়া হউক নববধূকে লইয়া রাত্রের মধ্যেই বাড়ী ফিরিতে হইবে।

পিতার আদেশ মত, একাদশবর্ষীয়া রক্তাম্বরমণ্ডিতা নব-পরিণীতাকে এবং তাহার সহচরী দাসীকে স্ত্রীগণের বিশ্রামাগারে প্রবেশ করাইয়া দিলাম। এই বিশ্রামাগারের দ্বারের নিকট আমাদের ট্রাঙ্ক, ঝুড়ি ও পুটালি স্তূপীকৃত করিয়া আমরা কেহ ট্রাঙ্কের উপর বসিয়া, কেহ বা বিছানার মোটের উপর বসিয়া তন্দ্রালসে ঢুলিতে লাগিলাম।

ই, আই, রেলওয়ের মগরা নামক ষ্টেশনের প্রায় দেড় ক্রোশ

দূরে, রতনপুর নামে একটা বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীগ্রাম আছে। আমার পিতা সেই গ্রামের এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী কয়েকখানা গ্রামের জমীদার। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র ; আমার নাম মোহনলাল মিত্র, আমি কলেজ হইতে বি-এ পরীক্ষায় উত্তমরূপে উত্তীর্ণ হইয়া, কলিকাতার এক মেসে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহিত্যে এম-এ পড়িতেছিলাম। আমার নবীন বয়স, দেহগৌরব ও বিদ্যার দৌড় দেখিয়া, এবং পিতার জমীদারী দেখিয়া এবং ঘটকের মুখে আমার কুলকাহিনী শুনিয়া, আমার শ্বশুর মহাশয় প্রায় আট হাজার টাকা খরচ করিয়া, আমার সহিত তাঁহার একাদশবর্ষীয়া কন্যার শুভবিবাহ দিয়াছিলেন। বিবাহের পরদিন গৃহস্থ সকলের মনস্তুষ্টি করিয়া, এবং জিনিসপত্র গুছাইয়া লইয়া, আমাদিগকে বিদায় দিতে তাঁহার এত বিলম্ব হইয়া গেল যে আমরা আমাদের ঈপ্সিত গাড়ী ধরিতে পারিলাম না।

তন্দ্রালসে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিবার পর, বাবা অনুসন্ধান লইয়া জানিতে পারিলেন যে লুপ প্যাসেঞ্জার প্লাটফরমে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন প্লাটফরমে আসিয়া ধীরে ধীরে গাড়ীতে আরোহণ করিলাম। আমরা পুরুষদিগের কামরায় বসিলাম ; নববধূ ঝির সহিত স্ত্রীলোকদিগের কামরায় বসিল। আমার মনে হইল, আহা, দীর্ঘকাল অন্য কামরায় থাকিয়া, আমার মনোমোহিনী কিরূপে আমার বিরহ ব্যথা সহ্য করিবে?

আমাদের কামরাটিতে বেশী জনতা ছিল না। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার ঠিক পূর্ব্বেই একজন প্রবীণ ভদ্রলোক, আমার পিতার

ন্যায় একখানা আলিয়ারে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, হাঁফাইতে হাঁফাইতে আমাদের কামরায় উঠিয়া পড়িলেন; তাঁহার সঙ্গে পাঁচ ছয়জন সঙ্গী উঠিল; এবং তাহাদের পিছু পিছু অল্পকাল মধ্যে অসংখ্য মোট, বাক্স, বস্তা, অগণ্য মুটিয়াতে গাড়ীতে তুলিয়া দিল। প্রবীণ ব্যক্তি পকেট হইতে টাকা বাহির করিয়া মুটিয়াদিগকে পুরস্কৃত করিলেন। মুটিয়ারা আনন্দে গাড়ী হইতে নামিয়া গেল। পরক্ষণে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মাঘমাসের শীতল বায়ু হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য আমি শালখানি মুড়ি দিয়া একটি কোণের নিবিড় ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। এবং আমার পিতার সহিত ঐ প্রবীণ ভদ্র-লোকের যে বাক্য বিনিময় হইল, তাহা নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতে লাগিলাম। স্থানাভাব বশতঃ কাহারও নিদ্রার সুযোগ হইল না।

ভদ্রলোকটি আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়ের কতদূর যাওয়া হবে?"

বাবা বলিলেন, "বেশীদূর নয়; আমরা এই মগরা ষ্টেশনে নেমে যাব। মশায় কোথায় যাবেন?"

ভদ্রলোক। পশ্চিমে, মির্জ্জাপুরে। আমি সেখানে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট।

বাবা। এই গাড়ী ত কেবল মোকামা পর্য্যন্ত যাবে, আপনি এই গাড়ীতে উঠলেন কেন?

ভদ্রলোক। সে কি, এটা কি পাঞ্জাব মেল নয়?

বাবা। পাঞ্জাব মেল ত রাত্রি সাড়ে ন'টার সময় হাওড়া ছেড়ে গেছে।

ভদ্রলোক। এখন কটা বেজেছে?

বাবা। রাত্রি দেড়টা।

ভদ্রলোক। বলেন কি? এত রাত্রি! দুটো লোকের সঙ্গে কথা কইতে আর একটু গোছগাছ করতে এত বিলম্ব হয়ে গেছে। আমি ত কিছুই বুঝতে পারিনি।

বাবা। কেন, আপনার কাছে কি ঘড়ি নেই?

ভদ্রলোক। ঘড়ি আছে; কিন্তু আমি দু'দিন এত ব্যস্ত ছিলাম যে, ঘড়িতে দম দেওয়ার কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম। এই দেখুন, ঘড়িটা বন্ধ হয়ে রয়েছে।

বাবা। হাওড়া ষ্টেশনেও ত ঘড়ি আছে, তা দেখলে ত এ ভুল হত না।

ভদ্রলোক। মশায়, আমরা পশ্চিমে লোক। আমরা এই হাওড়া ষ্টেশনে এলে এমন হতভম্ভ হয়ে যাই যে, চোখে আর কিছুই দেখতে পাই নে। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন মশায় একটা সৎ যুক্তি দিন। পরের ষ্টেশনে নেমে পড়ব কি?

বাবা। এর পর গাড়ী বেলুড় ষ্টেশনে থামবে। সেখানে নামতে চেষ্টা করলে সুবিধা হবে না। সেখানে গাড়ী কেবল মাত্র এক মিনিট দাঁড়াবে। এই অল্প সময়ে এত জিনিষ পত্র নিয়ে নামা শক্ত হ'বে; তার উপর এই ছোট ষ্টেশনে রাত্রিবাসের স্থানাভাব হ'বে। আমি বলি, আপনি রাত্রিটা গাড়ীতেই কাটিয়ে

দিন। গাড়ী ভোর রাত্রে বর্দ্ধমানে পৌছবে; সেখানে অনেকক্ষণ থামবে, আপনি সেখানে নামবেন। কাল বেলা সাড়ে বারটার সময় এক্সপ্রেস ট্রেণ বর্দ্ধমানে পৌছলে, আপনি তাতে উঠে মির্জ্জাপুরে যেতে পারবেন।

ভদ্রলোক। আপনি বেশ সদ্‌যুক্তির কথা বলেছেন; আমি আপনার পরামর্শমতই কায করব। মশায়ের নামটি জানতে পারি কি?

বাবা। আমার নাম শ্রীমহেন্দ্রনাথ মিত্র।

ভদ্রলোক। মশায়ের কি কায কর্ম্ম করা হয়?

বাবা। আমার সামান্য কিছু পৈতৃক জমীজমা আছে, তাই দেখাশুনো করি; অন্য কিছু কায করি না। মশায়ের নামটি কি?

ভদ্রলোক। আমার নাম শ্রীভোলানাথ দত্ত, জাতিতে সুবর্ণ বণিক।

বাবা। মশায় কি উদ্দেশ্যে কলকাতায় এসেছিলেন?

ভদ্রলোক। এই—উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য আমার কিছুই ছিল না। মির্জ্জাপুরে আমার স্ত্রী বিয়োগ হয়। স্ত্রী বিয়োগের পর কয়েক মাস আমার মনটা বড়ই খারাপ ছিল। তাই এই—সব বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধে, পনের দিনের ছুটি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম। এখন ছুটি শেষ হয়ে আসায়, আবার কর্ম্মস্থানে ফিরে যাচ্চি।

বাবা আর কোনও কথা কহিলেন না; গাড়ীর কাষ্ঠপ্রাচীরে ঠেশ দিয়া চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিয়া বসিয়া রহিলেন।

আমি আমার কোণটির ক্রোড়ে বসিয়া, ভদ্রলোকটিকে দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম, লোকটি প্রায় আমার পিতার সমবয়স্ক—বয়স প্রায় পঞ্চাশ বৎসর, তাঁহার দেহের আকৃতিও অনেকটা আমার পিতার ন্যায়। বাবার ন্যায় এই ভদ্রলোকেরও চোখে সোণার চশমা ছিল। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি, উভয়ের গাত্রাবরণও প্রায় একরূপ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাবার ভুল।

গাড়ী মগরা ষ্টেশনে থামিলে, আমাকে ও সমভিব্যাহারী অন্যান্য লোককে জিনিসপত্র নামাইবার জন্য নিযুক্ত করিয়া, বাবা তাড়াতাড়ি স্ত্রীলোকদিগের কামরার নিকট যাইয়া হাঁকিলেন—"ঝি ও ঝি! বৌকে নিয়ে শীঘ্রি নেমে পড়। আমরা নেমেছি; নাম, নাম, শীঘ্রি নাম, গাড়ী এখনই ছেড়ে দেবে।"

বুদ্ধিমতী ঝি রক্তবস্ত্র মণ্ডিতা নববধূকে লইয়া শীঘ্র নামিয়া পড়িল। এক মিনিট পরেই গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

বাবা অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন যে, আমাদিগকে রতনপুরে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল অশ্বযান ষ্টেশনের বাহিরে উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল, তাহা তখনও সেখান হইতে ফিরিয়া যায়

নাই ; ষ্টেশনের বাহিরেই আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তিনি আমাকে বলিলেন, "তুমি বউমাকে নিয়ে আর তার ঝিকে নিয়ে ঘরের গাড়ীতে চড়ে আগেই চলে যাও। আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে পিছনে আসছি।"

বাবার অনুমতি পাইয়া, আমি আমার মনোমোহিনী পত্নীকে এবং তদীয়া সহচরী ঝিকে লইয়া, আমাদের বাটী হইতে আগত অশ্বযানে আরোহণ করিলাম ; এবং নবোঢ়ার লজ্জা নিবারণের জন্য যানের দুইটী দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলাম। আমি নববধূকে আমার বাম পার্শ্বে বসাইয়া উপবেশন করিলাম। আমাদের সম্মুখের আসনে পরিচারিকা উপবিষ্ট হইল। আবদ্ধ গাড়ীর ভিতর ঘোর অন্ধকার বিরাজ করিতে লাগিল।

আমি নবীন প্রণয়ী, সেই অন্ধকারের সহায়তায় আমি ধীরে ধীরে হস্ত সঞ্চালন করিয়া, নববধূর করতল আপন হস্তে গ্রহণ করিলাম। সে তাহার সুকোমল করতল একটুও আপত্তি না করিয়া আমার লোলুপ হস্তে ছাড়িয়া দিল। তাহা হস্তে রাখিয়া আমি হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিলাম। মনে হইল, যেন সেই শৃঙ্খলিত হস্তের ভিতর দিয়া, পরস্পরের হৃদয়ের প্রথম অনুরাগ, পরস্পরের হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছে। অনুরাগোচ্ছ্বাসে আমি সেই কোমল করতল ঈষৎ নিপীড়িত করিলাম ; এবং তাহাকে আরও একটু নিকটে টানিয়া লইলাম। সে আমার দেহে তাহার কোমল ও অনুরাগতপ্ত দেহ অনুলিপ্ত করিয়া বসিল। আমি ভাবিলাম, এই বালিকা গতকল্য রাত্রে আমাকে বিবাহ করিয়াছে, আর

বিধির আশ্চর্য্য বিধানে, আজই তাহার হৃদয়ে আমার প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত হইয়াছে। এই অনুরাগময়ীকে পাইয়া আমি অবিলম্বে যে প্রেমের নীড় বাঁধিতে পারিব, তাহাতে সারাজীবন মধুর প্রেমের সঙ্গীতই কুজিত হইবে। আমি তাহার হস্ত ছাড়িয়া দিয়া, আদরে তাহার চিবুকপ্রান্তে হাত দিলাম, তাহার ঈষদুষ্ণ কোমল কপোলে হাত বুলাইলাম—যেন সুকোমল মখমলে আমার হাত পড়িল। আমার আদরে আনত হইয়া, সে তাহার মুখখানি আমার স্কন্ধের উপর স্থাপিত করিল। আমি আরও আদরে তাহার কণ্ঠ বাহুবন্ধনে বেষ্টিত করিয়া, তাহার মুখ আমার মুখের নিকট তুলিয়া লইলাম; তাহার নিঃশ্বাস বায়ুর বিমল সৌরভ গ্রহণ করিলাম; অধরের দ্বারা তাহার ললিত অধর স্পর্শ করিলাম; তাহার পর তাহাতে একটা শব্দহীন চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলাম। এই সমস্ত ব্যাপর পরিচারিকার অগোচরে অন্ধকারের আচ্ছাদনের অন্তরালে নীরবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

নিশাবসানে আমরা রতনপুরে আসিয়া পৌঁছিলাম। সারারাত আমাদের জন্য অপেক্ষা করিয়া পুরবাসিগণ তখন নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিল। আমাদের অনেক ডাকাডাকিতে গৃহস্থের নিদ্রাভঙ্গ হইল। আমার মাতাঠাকুরাণী, অন্যান্য কুটুম্বিনীসহ, বধূকে, ভিতর বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য বহির্ব্বাটীতে আসিলেন। কুটুম্বিনীগণ কেহ শঙ্খধ্বনি, কেহ হুলুধ্বনি করিলেন। বধূর মুখ দেখিবার জন্য দাসীগণ হস্তধৃত দীপ সকল তুলিয়া ধরিল। বধূর পরিচারিকা বধূর অবগুণ্ঠনবস্ত্র ললাটের উপর

হইতে অপসারিত করিল। প্রথানুযায়ী বধূ চক্ষুর্দ্বয় মুদিত করিল।

আলোকরশ্মি প্রতিফলিত সেই মুখ দেখিয়া আমি চমকাইয়া উঠিলাম। একি ভ্রান্তি! শুভদৃষ্টির সময়, এবং বাসর ঘরে অবগুণ্ঠনের অন্তরালে যে নোলক পরা মুখ দেখিয়াছিলাম, এ ত সে মুখ নয়! সেই বালিকাসুলভ সরল মুখে ত উন্মেষোন্মুখ যৌবনের এই উজ্জ্বল দীপ্তি ছিল না! কে এ কিশোরী?

বধূর সেই মুখ দেখিয়া এক কুটুম্বিনী কহিলেন—আমরা শুনেছিলাম বৌয়ের বয়স মাত্র এগার বছর; কিন্তু মুখ দেখে বেশী মনে হচ্চে।"

বধূর পরিচারিকা বলিল, "কৈ, এগার বছর বয়সের কথা ত আমরা কখনও বলি নি। দিদিমণি আমাদের এই চৌদ্দ উৎরিয়ে পনের বছরে পা দিয়েছে। সে কথা ত জামাই বাবু জানেন। তিনি নিজে যেদিন দিদিমণিকে দেখতে গিয়েছিলেন, সেই দিনই ত সে কথা তাঁকে বলা হয়েছিল।"

একজন ঠান্‌দিদি আমার নিকটে দাঁড়াইয়া ছিলেন; কর্ণমর্দ্দন তাহার রসিকতার একটি অঙ্গ। তিনি আমার কাণ মলিয়া দিয়া কহিলেন—"মুখটি ত দিব্যি ভাল মানুষের মত; কিন্তু তোমার পেটটি সয়তানী বুদ্ধিতে ভরা। আমাদিকে লুকিয়ে বুঝি নিজে কনেকে দেখতে যাওয়া হয়েছিল?"

আমার পরিণীতা পত্নী কোথায় গেল, সেই চিন্তায় আমি তখন বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলাম। কাতর কণ্ঠে কহিলাম, "আমি

তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করে বলছি ঠানদিদি, আমি কথনও কনে দেখতে যাই নি। আর এখানে যাকে দেখছ, তাকে আমি বিয়ে করি নি।"

ঠানদিদির রসিকতা তথনও থামে নাই। তিনি বলিলেন, "বল কি, বিয়ে কর নি? তবে নিকে করেছ নাকি?"—এই বলিয়া তিনি আবার আমার কাণ মলিয়া দিলেন।

আমি বলিলাম, "ঠানদিদি, তুমি ছবার আমার কাণ মলে দিয়েছ, ঠিক করেছ। কাণ মলে দেবার কাযই আমি করেছি। ভুল করে' নিজের কনের বদলে অন্য লোকের কনেকে ঘরে এনেছি। আমাদের বৌ না জানি গাড়ী থেকে কোন বিদেশে গিয়ে কত বিপদে পড়বে। এথন কি উপায় হবে? যাই বাবার সঙ্গে পরামর্শ করিগে। আপাততঃ তুমি মাকে বারণ কর, তিনি যেন এই বউকে বরণ না করেন।"

মা তাহাকে বরণ করিলেন না। বাবা বাটীতে আসিয়া বলিলেন, যে না, সে তাঁহার পুত্রবধূ নহে। তাঁহার পুত্রবধূর নাম ইন্দুলেথা; কিন্তু পরিচারিকাকে প্রশ্ন করিয়া বুঝিলেন যে এই বধূর নাম প্রমীলা; এবং তাহারা জাতিতে কায়স্থ নয়,—সুবর্ণ বণিক। বরের নাম কি, বা তাহার বাড়ী কোথায়, পরিচারিকা তাহা বলিতে পারিল না। কিন্তু সে বুঝিল যে, যাহাকে সে তাহাদের জামাই বাবু মনে করিয়া গাড়ী হইতে নামিয়াছিল, তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্য এক জামাই বাবুর পিতা।

কুটুম্বিনীগণ পরিচারিকা ও প্রমীলাকে বহু প্রশ্ন করিয়া যাহা

জানিতে পারিলেন, তাহা শুনিয়া বাবা ও আমি উভয়েই বুঝিলাম যে মির্জ্জাপুরের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সেই ভোলানাথ দত্তই প্রমীলাকে বিবাহ করিয়া মির্জ্জাপুরে লইয়া যাইতেছিলেন; পত্নী বিয়োগের পর কলিকাতায় আসার উদ্দেশ্যটা তিনি কিছুই নয় বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে এই বিবাহ! রাত্রে অন্ধকারে পরিচারিকা বাবাকে ভোলানাথ দত্ত মনে করিয়া, তাঁহার আহ্বানে গাড়ী হইতে নামিয়াছিল।

বাঙ্গালার কোন বিখ্যাত কবির কোনও কাব্যে এই রূপ একটি ঘটনা পাঠ করিয়া আমি মনে করিতাম যে উহা কবির অলীক কল্পনা মাত্র। আজ বুঝিলাম, বাস্তব জীবনেও এরূপ ঘটনা বিরল নহে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভুলের প্রতিকার।

ব্যাপারটা বেশ বুঝিয়া বাবা বলিলেন, "এই ভুলের সহজেই প্রতিকার করা যেতে পারবে। তাঁরা এক্সপ্রেস গাড়ী ধরবার জন্যে আমার পরামর্শমত নিশ্চয় বর্দ্ধমান ষ্টেশনে নামবেন। মোহনলাল ব্যাণ্ডেলে গিয়ে এক্সপ্রেস্ ধরে বর্দ্ধমানে পৌঁছে, এই বউটিকে ভোলানাথ বাবুর কাছে পৌঁছে দিয়ে, আপন বউকে ফেরত নিয়ে আসতে পারবে।"

মাতা সন্দেহ করিয়া কহিলেন—"কিন্তু তাঁরা যদি আমার বউকে তাদের বউ নয় বুঝে, বর্দ্ধমানে গাড়ী থেকে না নামিয়ে থাকেন, তা হলে বেচারা না জানি কোন দেশে গিয়ে পড়বে! হয়ত গাড়ীতেই বসে মোকামা ষ্টেশন পর্য্যন্ত গিয়ে পড়বে।"

বাবা বলিলেন, "আমি তারও প্রতিকার করব। আমি টমটম গাড়ী জুতে এখনই মগরা ষ্টেশনে যাব। সেখান থেকে তার করে লুপপ্যাসেঞ্জার কোথা আছে জেনে, খবর দিয়ে যাহোক একটা বন্দোবস্ত করে ফেলব।"

আমি বাবার উপদেশ মত কার্য্য করিলাম। প্রমীলা ও তাহার পরিচারিকা মুখ হাত ধুইয়া, কিছু জলযোগ করিয়া লইল। আমি গরমজলে স্নান করিয়া রাত্রিজাগরণের ক্লান্তি বিধৌত করিয়া ফেলিলাম; এবং চায়ের সহিত কিছু আহার করিয়া, শরীরে নব উৎসাহ সঞ্চয় করিলাম। তাহার পর প্রমীলা ও তাহার বুদ্ধিমতী পরিচারিকাকে লইয়া, আমাদের ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আসিলাম। যতক্ষণ আমরা অশ্বযানে ছিলাম, ততক্ষণ প্রমীলা তাহার অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বার বার আমার দিকে চাহিতেছিল!

এক্স্‌প্রেস ট্রেণ যথাসময়ে ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিলে, আমরা তাহাতে আরোহণ করিলাম।

ট্রেণ যথাসময়ে বর্দ্ধমান পৌছিল। দেখিলাম, সেখানে ভোলানাথ বাবু সকলকে লইয়া এবং তাঁহার বিপুল দ্রব্য সামগ্রী লইয়া গাড়ীতে উঠিতে চেষ্টা করিতেছেন। দেখিলাম, তিনি

আমাদিগের ভুল সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ মনোমধ্যে পোষণ না করিয়া, আমার পরিণীতাকেই আপনার বধূ মনে করিয়া গাড়ীতে উঠাইয়া দিতেছেন।

আমি তাঁহার ভুল সংশোধন করিয়া, প্রমীলাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিলাম; এবং ইন্দুলেখার ক্ষুদ্র হাতখানি ধরিয়া বলিলাম, "তুমি আমার সঙ্গে রতনপুরে যাবে। তুমিই আমারই বিবাহিতা স্ত্রী।"

যতক্ষণ গাড়ী বর্দ্ধমানে ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ছিল, ততক্ষণ আমি ইন্দুলেখা ও তাহার পরিচারিকাকে অপেক্ষা করিবার ঘরে রাখিয়া, ভোলানাথ বাবুর নিকটে আসিয়া গল্প করিতে লাগিলাম এবং ভুলটা কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বুঝাইয়া দিলাম। আমি যতক্ষণ ভোলানাথ বাবুর সহিত কথা কহিতেছিলাম, দেখিলাম, ততক্ষণ গাড়ীর একটি নিভৃত স্থানে বসিয়া, প্রমীলা অন্যের অগোচরে অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বারবার আমাকে বিষাদপূর্ণ নয়নে নিরীক্ষণ করিতেছে। অশ্বযানে অন্ধকারের আশ্রয়ে আমি প্রমীলার প্রতি যে অনুরাগ দেখাইয়াছিলাম, তাহা মনে করিয়া আমি তাহার সেই বিষণ্ণ দৃষ্টিপাতে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিলাম। ভাবিলাম, অজ্ঞাতে কি মহা অন্যায় কার্য্যই করিয়া ফেলিয়াছি! এই অন্যায়ের স্মৃতি, দুষ্টক্ষতের ন্যায় বোধ হয় চিরদিন আমার ব্যথিত হৃদয়ে জাগিয়া থাকিবে।

এক্‌স্‌প্রেস গাড়ী বর্দ্ধমান ষ্টেশন ছাড়িয়া দিল। আমার মনে হইল, তাহার চক্ষু যেন জলভারে ছলছল করিয়া উঠিয়াছে।

ধিক্কারের ধূম উদ্‌গীরণ করিতে করিতে গাড়ী আমার দৃষ্টিপথের বাহির হইয়া গেল।

বাবা যথাসময়ে বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌঁছিলেন। আমি প্ল্যাটফরমে তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া ছিলাম, তাঁহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া লইলাম। তিনি স্ত্রীলোকদিগের বিশ্রাম ঘরে ইন্দুলেখাকে স্বচক্ষে দেখিয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইলেন।

আমরা বাড়ী ফিরিলাম। মা বধূকে বরণ করিয়া, ঘরে উঠাইলেন। এইরূপে সকল গোলযোগ মিটিয়া গেল। তাহার পর নির্ব্বিঘ্নে বাটীতে বৌভাতের আয়োজন চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রেম-লীলার ব্যাঘাত।

উপরিউক্ত ঘটনার পর ছয়টি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি তখন ইংরাজি সাহিত্যে এমে-এ পাশ করিয়া এবং বি-এল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ইন্দুলেখার অভিনব প্রেমসাগরে হাবুডুবু খাইতেছিলাম। প্রেমসাগরের সেই অবগাহনে প্রমীলা-ঘটিত ঘটনার ছায়া পর্য্যন্ত আমার মন হইতে বিধৌত হইয়া গিয়াছিল। তখন আমার অন্তরে ও বাহিরে কেবল মাত্র ইন্দুলেখাই সর্ব্বাধিকার বিস্তার করিয়াছিল।

একদিন সকাল বেলা, আমাদের এই প্রেমের রাজ্য সহসা

আক্রমিত হইল। আমাকে নিকটে আহ্বান করিয়া পিতা বলিলেন, "দেখ মোহনলাল, তুমি বাড়ীতে অলসভাবে বসে কেবল মাত্র আমোদ প্রমোদে দিন কাটিয়ে দাও, এটা আমার ইচ্ছা নয়। তোমাকে অর্থোপার্জ্জন করতে হবে। তুমি জান যে আমার জমীদারীর বার্ষিক আয় ছ' হাজার টাকা মাত্র। তোমরা চার ভাই; এই জমীদারী তোমাদিকে ভাগ করে' দিলে, তোমরা এক একজন বৎসরে দেড় হাজার টাকা হিসাবে পাবে। এর পর তোমাদের ছেলে মেয়ে হবে, সংসার বড় হবে। ঐ সামান্য দেড় হাজার টাকা আয়ে কি তোমাদের চলবে?"

আমি বলিলাম, "না, আমাদের জমীদারি অন্ততঃ চারগুণ বৃদ্ধি করবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। আপনি যা অনুমতি করবেন, আমি তাই করব।"

বাবা বলিলেন, "আমার ইচ্ছা যে তুমি কালকাতা গিয়ে হাইকোর্টে ওকালতি আরম্ভ করে দাও। তা ছাড়া আমার ইচ্ছা যে তোমার ছোট ভাইগুলি তোমার কাছে থেকে কলকাতাতেই লেখাপড়া করে।"

আমি বলিলাম, "হুগলীতে থাকায় তাদের মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হয়, তাতে পড়ার বিশেষ বিঘ্ন ঘটে।"

বাবা বলিলেন, "তা ছাড়া তুমি তাদের লেখাপড়া নিজে দেখলে যেমন ভাল হবে, প্রাইভেট মাষ্টারের দ্বারা তা কখনই হওয়া সম্ভব নয়। হুগলীতে মাসে দেড় শ টাকা আমার খরচ হত। কলকাতায় তুমিও থাকলে বলে, হয়ত দুশো টাকা খরচ হতে

পারে। আর তুমি যদি একখানা গাড়ী রাখ—ওকালতিতে পসার করতে হলে, একখানা ব্রাউনবেরী বা অফিসযান রাখতেই হবে—পঞ্চাশ টাকা বেশী দেব।"

আমি বলিলাম, "আমার বোধ হয় অত টাকা পাঠাবার আবশ্যক হবে না; আমিও ত মাসে মাসে কিছু কিছু উপার্জ্জন করব।"

বাবা সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আপাততঃ ছ'মাস কোনও উপার্জ্জনের আশাই কোরো না। যদি কিছু পাও, নিজের পোষাক পরিচ্ছদ আর গৃহসজ্জায় তা ব্যয় কোরো;—নূতন উকিলের পক্ষে ঐগুলি আইনের পুস্তকের চেয়ে বেশী দরকার।"

আমি বলিলাম, "আপনি যা আজ্ঞা করছেন, আমি তাই করব। আমাকে কবে কলকাতায় যেতে হবে?"

বাবা বলিলেন, "এখনও তার দেরী আছে। এটা জ্যৈষ্ঠমাস, আম কাঁটালের সময়, এ সময়ে তোমার ভাইদের স্কুল কলেজ বন্ধ আছে। এ সময় তোমার শ্বশুর মশাইকে একখানা চিঠি লিখে এ সম্বন্ধে তাঁর মতটা জেনে নিই। তিনি কলকাতার লোক, বহুদর্শী; এ সব ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ নেওয়া ভাল।"

কলিকাতায় গিয়া আমি ওকালতি করিব, এ কথা শীঘ্র বাটীতে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। শুনিয়া, ইন্দুলেখা আমার নিকটে আসিয়া বলিল, "বড় ভাল হল। তুমি কলকাতায় গেলে, আমি বাপের বাড়ীতে গিয়ে থাকব। আর তুমি সর্ব্বদা আমার কাছে আসবে। এখানে দিনের বেলায় তোমার সঙ্গে

দেখা করবার যো নেই; সেখানে কোন বাধাই থাকবে না।"

আমি বলিলাম, "ইন্দু! তুমি আমার বাবাকে এই ছয় বছরেও চিনতে পারনি? আমাদের এই প্রেমের স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে তিনি আমাকে একটা জাগ্রত সংসারের বাস্তব কর্ম্মের মধ্যে ফেলে দিতে চান। বেশ জেনো, ওকালতিতে আমর ভালরকম পসার না হলে, তিনি তোমাকে কলকাতায় পাঠাবেন না। তিনি ইচ্ছা করেছেন যে তোমাকে আমাকে কিছুদিনের জন্যে—অবশ্য আমাদেরই মঙ্গলের জন্যে—পৃথক করে দেবেন। তোমায় ছেড়ে আমাকে একলাই কলকাতায় থাকতে হবে। তোমায় না দেখে আমি কেমন করে বাঁচব, আমি কেবল তাই ভাবছি।" বলিয়া আমি তাহার ললিত বাহুদ্বয় আপন কণ্ঠে তুলিয়া লইলাম।

আমরা এই প্রেম শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়া, আরও একমাস পরম সুখে অতিবাহিত করিলাম। ইত্যবসরে বাবা আমার শ্বশুর মহাশয়কে পত্র লিখিলেন। তিনি প্রত্যুত্তরে লিখিলেন যে, আমি যদি কালকাতায় গিয়া ওকালতি করি, তিনি আমার মক্কেল জুটাইয়া দিতে পারিবেন এবং অন্য প্রকারে আমার অনেক সহায়তা করিতে পারিবেন। তাঁহার পত্র পাইয়া, বাবা কলিকাতায় গেলেন; এবং তাঁহার সাহায্যে কলুটোলা অঞ্চলে একটা ছোট বাড়ী ভাড়া লইলেন। ঐ বাড়ীতে গাড়ী ঘোড়া রাখিবার স্থানও ছিল। আমার শ্বশুর মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, আমি কলিকাতায় পৌছিলে, তিনি আমাকে একখানা গাড়ী

ও একটা ঘোড়া উপহার দিবেন। আগামী জুলাই মাসের প্রথম হইতে আপাততঃ পাঁচ বৎসরের জন্য বাড়ীভাড়া লওয়া হইল। ৪ঠা জুলাই আমাদের কলিকাতা যাইবার দিন নির্দ্ধারিত হইল।

যাত্রার দিন যথাসময়ে দ্বারে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। আমি ইন্দুলেখার নিকট বিদায় লইতে গেলাম। সে কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিল।

আপন উত্তরীয় প্রান্তে আমি তাহার নয়নাশ্রু বিদূরিত করিয়া কহিলাম, "কেঁদ না, ইন্দু। মাঝে শ্রাবণ ভাদ্র দুটো মাস, আশ্বিন মাসে আমি আসব।" কথাটা বলিতে আমারও চোখে জল আসিল। কিন্তু তখন আর কান্নাকাটির সময় ছিল না; আমি তাড়াতাড়ি বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আকস্মিক দুর্ঘটনা

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। শ্বশুর মহাশয়ের পরামর্শে আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, ছোট আদালতে চার পাঁচ বৎসর কায করিয়া, পরে একটু পাকা হইয়া হাইকোর্টে যাইব। তোমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইবে যে, এই প্রথম এক মাসে আমি ছোট আদালত হইতে প্রায় পঞ্চাশ টাকা আমার কলুটোলার বাসায়

আনিতে পারিয়াছিলাম। ওকালতি-গগনে প্রথম উড়িতে শিখিয়া নবীন উকীলের পক্ষে ইহা কম বাহাদুরীর কথা নয়!

আজ সকালে নিম্নতলে আমার আফিসঘরে বসিয়া ভ্রাতাদিগকে অঙ্ক বুঝাইয়া দিতেছিলাম। বাহিরে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। এক একটা অঙ্ক বুঝাইবার পর, এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতেছিলাম। ভাবনাটা মেঘদূতের নির্ব্বাসিত যক্ষের অনুরূপ হইতেছিল কি না ঠিক মনে নাই; কিন্তু এই বাদলের দিনে আমার ন্যায় বিরহসন্তপ্ত প্রবাসী, প্রিয়তমার ভাবনা ছাড়া অন্য ভাবনা ভাবে কি?

ভাবিতে ভাবিতে জানালার বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, আমাদের বাটীর সম্মুখ দিয়া একখানা ভাড়াটিয়া গাড়ী বৃষ্টির জলে কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়াছে। অশ্বযান দৃষ্টির বাহিরে যাইতে না যাইতে একখানা মোটর গাড়ী অতি দ্রুতবেগে চলিয়া গেল। আর এক মুহূর্ত্ত পরে একটা বিকট শব্দে আমার সকল ভাবনা চূর্ণ হইয়া গেল।

সেই শব্দটা শুনিয়া, ভ্রাতা মাখনলাল এক লম্ফে রাস্তায় গিয়া পড়িল। সেখানে যাইয়া হাঁকিল, "দাদা, মেজদা, সেজদাদা, বাইরে এস, এখানে তিনটে লোক বোধ হয় একেবারে মারা গিয়েছে।"

আমরা বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। একটু পরীক্ষা করিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে আমাদের বিলম্ব হইল না। রাস্তার এই বক্রস্থানে অগ্রগামী অশ্বযানটা দেখিতে না পাইয়া,

অনুগামী মোটর গাড়ী যথাসময়ে আপনার গতিবেগ প্রশমিত করিতে পারে নাই। তাহার ধাক্কায় অশ্বযানটা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ঐ যানের আরোহিদ্বয় এবং কোচম্যান দারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইয়া, রাস্তার আর্দ্র কঙ্করে মৃতবৎ পড়িয়া আছে। ঘোড়া দুইটা, ভাঙ্গা গাড়ীর কিয়দংশ লইয়া রক্তাক্ত কলেবরে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে। কিন্তু আমরা মোটর গাড়ীখানার ছায়া মাত্র দেখিতে পাইলাম না; তাহা প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়াছিল।

নিকটবর্ত্তী দুই একটি বাটীর ভদ্র অধিবাসিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, আমরা অবিলম্বে যথাকর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিলাম। গাড়ীর আরোহিদ্বয়ের মধ্যে একজন ভদ্রবেশী যুবক; তাহার বয়স বিংশ বা একবিংশ বৎসর হইবে; তাহার দক্ষিণ উরুর হাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। অন্যা আরোহিণী একজন শুভ্রবেশধারিণী ভদ্র বিধবা; তাঁহার মুখমণ্ডল ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল; ঐ সকল ক্ষতের শোণিতে তাঁহার মুখ সম্পূর্ণ আবৃত থাকায় আমরা তাঁহার বয়স অনুমান করিতে পারিলাম না। আমি এই দুই আরোহীকে কতকগুলি লোকের সাহায্যে, আমার ঘরের গাড়ীতে তুলিয়া, মেডিক্যাল কলেজের দিকে ছুটিলাম। পাড়ার এক ভদ্রব্যক্তি কোচম্যানকে মেডিক্যাল কলেজে পাঠাইবার ভার লইলেন। আরোহীদের দুইটি পেটক, একটি বাক্স, এবং একটি বিছানার মোট রাস্তায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল; সেই দ্রব্যগুলি অশ্ব দুইটি এবং ভগ্ন গাড়ী কলুটোলা পুলিশের জিম্মা দিবার জন্য আমি মাখনলালকে উপদেশ দিয়া আসিলাম।

মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষরা আমার পরিচয় গ্রহণ করিয়া, রোগীদের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন। আমি স্নানাহারের জন্য বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। আহারাদির পর আমার ভাই-য়েরা স্কুল কলেজে চলিয়া গেল।

সেদিন আদালতে আমার কোনও কায ছিল না। প্রভাতে শয্যাত্যাগ করিয়াই আমি স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, ইন্দু-লেখাকে এক দীর্ঘ প্রেমপূর্ণ পত্র লিখিয়া প্রবাসের দীর্ঘ মধ্যাহ্নটা অতিবাহিত করিব। কিন্তু আহতগণের চিন্তা আমার চিত্তকে এতই বিচলিত করিয়াছিল যে, আমি সেই মনোজ্ঞ কার্য্যে একটুও মনোনিবেশ করিতে পারিলাম না। তাঁহাদের সংবাদ লইবার জন্য আমি চঞ্চল চিত্তে পুনরায় বেলা বারটার পূর্ব্বে মেডিক্যাল কলেজে গেলাম।

সেখানে আমি প্রথমে সেই যুবক আহতের নিকট উপস্থিত হইলাম। সে খট্টায় শুইয়া যন্ত্রণায় কাতরধ্বনি করিতেছিল। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া, অতি কষ্টে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি আমি সংগ্রহ করিতে পারিলাম। ভদ্রা বিধবাটি তাহার মাতা। তাহারা কাশীতে বাস করে। তাহার নাম মন্মথনাথ দত্ত। তাহার মাতার মামাতো ভাইয়ের বিবাহ; সেই উপলক্ষ্যে তাহারা কলিকাতায় আসিয়াছিল; কিন্তু মাতার মাতুলালয়ে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাহাদের এই বিপদ ঘটিয়াছে। মাতার মাতুলের নাম উমাচরণ মল্লিক। আমা-দের বাড়ী যে রাস্তার ধারে ছিল, ঐ মাতুলের বাড়ীও সেই রাস্তার ধারে; আমাদের বাটীর নম্বর ২৩, ঐ মাতুলের বাটীর নম্বর ৯৬।

আমি স্থির করিলাম যে উমাচরণ মল্লিককে অবিলম্বে এই বিপদের সংবাদ দিব। যুবককে ঔষধ সেবন করাইবার জন্য একজন শুশ্রূষাকারিণী তাহার নিকটে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে যুবকের উরুর অস্থি কেবল মাত্র একস্থানে ভাঙ্গিয়াছিল ; তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া, বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে ; যদি অন্য কোনও রকম উপসর্গ উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে, যুবক এক মাসের মধ্যে সুস্থ হইয়া উঠিবে।

যুবক সম্বন্ধে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া, আমি অতঃপর তাহার মাতাকে দেখিতে গেলাম। তিনি অন্যান্য স্ত্রীরোগীর সহিত একই কক্ষে একটা লৌহখট্টায় শায়িতা হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। চিবুক হইতে ললাট পর্য্যন্ত তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রায় সমস্ত ভাগই শ্বেত বস্ত্রের পটীর দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ একটা শ্বেতবর্ণ আস্তরণের দ্বারা আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সমীপবর্ত্তিনী শুশ্রূষাকারিণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাঁহার আঘাত অতি সামান্য—ললাট, ভ্রূদ্বয় ও চিবুক কিছু কিছু কাটিয়া যাওয়ায় কিছু রক্তপাত হইয়াছে মাত্র। সাতদিন মধ্যে সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিবেন।

আমি তাঁহাকে জাগরিত করিবার চেষ্টা করিলাম না। কিন্তু বাহিরে আসিয়া তাঁহার জন্য একটি পৃথক কক্ষ ভাড়া লইবার বন্দোবস্ত করিলাম। কারণ অন্য স্ত্রীগণের সহিত এই ভদ্রবংশীয়া মহিলা একত্রে থাকেন, ইহা আমার পছন্দ হইল না। দৈনিক তিন টাকা ভাড়ায় একটি কক্ষ পাওয়া গেল। বাটী হইতে টাকা

আনিয়া আমি সাতদিনের ভাড়া জমা দিলাম। ইহা ছাড়া, হিন্দু বিধবার উপযুক্ত আহার ও গঙ্গাজলের বন্দোবস্ত করিলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

উমাচরণ মল্লিক।

বাটী ফিরিয়া বৈকালিক জলযোগের পর, বিধবার মাতুল শ্রীযুক্ত উমাচরণ মল্লিকের সন্ধানে আমি বাহির হইলাম। কর্দ্দমাক্ত ও পিচ্ছিল পথ অতিক্রম করিয়া, আমি প্রত্যেক বাটীর নম্বর লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলাম। অবশেষে ৯৫ নম্বর বাটী দেখিলাম; তাহার পরই ৯৬ নম্বর বাটী পাইব; কিন্তু তাহা পাইলাম না; ৯৫ নম্বর বাটীর পর একেবারে ৯৭ নম্বর বাটী দেখিলাম। ৯৬ নম্বর বাটী কোথায় গেল?

রাস্তার পরপারে কতগুলি লোক একত্র হইয়া দুই তিন খানি অশ্বযানে উঠিতে যাইতেছিল। এই ভদ্রগণের এক অনুচরের হস্তে বরের মাথার একটি টোপর দেখিয়া এবং অন্যান্য চিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, আমি তাঁহাদিগকে বিবাহের যাত্রী মনে করিলাম। তাঁহাদের মধ্যে একজনের নিকটে যাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশায় বলতে পারেন, ৯৬ নম্বর বাড়ী কোনটি?"

ভদ্রলোকটি আপন হস্তধৃত ছত্রের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, "ঐ গলির মধ্যে ঢুকে সমুখের বাড়ী।"

আমি একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে ৯৫ ও ৯৭ নম্বর বাটীর মধ্যে একটি সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে। তাহাতে একজন লোক কষ্টে প্রবেশ করিতে পারে; কোন বিশেষ স্থূলকায় ব্যক্তি উহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে কি না সন্দেহ। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "মশায় কি বলিতে পারেন, ঐ ৯৬ নং বাড়ীতে কে বাস করেন?"

ভদ্রলোকটি কহিলেন, "কেন? ওখানে আমি বাস করি।"

আমি। মশায়ের নাম কি উমাচরণ মল্লিক?

ভদ্রলোক। হ্যাঁ, আমারি নাম উমাচরণ মল্লিক। আমাকে আপনার কি প্রয়োজন?

আমি। একটা অশুভ সংবাদ আপনাকে দিতে এসেছি।

ভদ্রলোক। রাম রাম! আমি একটা শুভকার্য্যে বেরুচ্চি, এ সময় আপনি একটা অশুভ সংবাদ কোথা থেকে আনলেন?

আমি। সব বলছি; আপনি একটু স্থির হয়ে শুনুন।

ভদ্রলোক। স্থির হয়ে শোনবার সময় আমার নেই। আমি ছেলের বিবাহ দিতে বেরিয়েছি। হাওড়ায় ছ'টার গাড়ী ধরতে হবে। তা নইলে, আটটার পূর্ব্বে হুগলিতে পৌঁছতে পারব না। আটটার পরই লগ্ন।

আমি। আপনি অনায়াসেই ছ'টার আগে হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছতে পারবেন। এখনও পাঁচটা বাজতে অনেক দেরী আছে।

ভদ্রলোক। তা থাকুক; এখন আপনার অশুভ সংবাদটা কি

তা শীঘ্র বলে ফেলুন। কিন্তু এই শুভকার্য্যের সময় অশুভ সংবাদ নিয়ে আসা কি আপনার ভাল হয়েছে?

আমি। কি করব মশায়, সংবাদটা আপনাকে না বল্লেই নয়, তাই এসেছি। আপনার এক ভাগিনেয়ী আছেন জানেন?

ভদ্রলোক। আমি জানব না ত কি আপনি জানবেন? বাপ মা মরা মেয়ে! আমি তাকে মানুষ করলাম, রাজার মত ধনী পাত্র দেখে তার বিয়ে দিলাম, তারপর…

আমি। তিনি এখন বিধবা, তাও বোধ হয় আপনি জানেন?

ভদ্রলোক। আমার জানতে কিছুই বাকী নেই। বিধবা হবার পর স্বামীর অনেকগুলো টাকা নিজের হাতে পেল। আমি বল্লাম, আয় আমার কাছে আয়, আমি তোকে ছেলেবেলা থেকে মানুষ করেছি—আমারি কাছে এসে থাক্; আর ধাড়ি ধাড়ি ছেলেগুলো ঐ মবলক টাকা অপব্যয় করবার আগে ওটা আমার কাছে গচ্ছিত রাখ্; তা মশায়, কলিকাল কি না, কলির ধর্ম্ম কোথায় যাবে? আমার কথা অগ্রাহ্য করলে। কাশীতে স্বামীর একখানা বাড়ী ছিল; ছেলেগুলোকে নিয়ে সেইখানে বাস করতে লাগল। কর্‌করে টাকাগুলো ছেলেদের লেখাপড়া শেখাবার জন্যে মচমচ করে খরচ করতে লাগল। আরে বাপু, ছেলেদের লেখা-পড়া শেখালে কি তোর পেট ভরবে? না, তোর ধর্ম্মের পথ পরিষ্কার হবে? আমার কাছে থেকে ব্রত নিয়ম, ধর্ম্ম কর্ম্ম করলে, তোর পেটও ভরতো, আর স্বর্গের পথও পরিষ্কার হত।

আমি। আপনি বোধ হয় তাঁকে আপনার ছেলের বিবাহে নিমন্ত্রণ করেছিলেন ?

ভদ্রলোক। আসবে না, জানি। তবু আমার কর্ত্তব্যের ত্রুটি করি কেন ? তাই একখানা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম, আমার ছেলের বিয়েতে দু'ভরি সোণা কিংবা অভাবপক্ষে দুটো গিনি দিয়েও আশীর্ব্বাদ করবে ; তা' এপর্য্যন্ত উপুড় হস্ত করে নি। মশায় একবার ভেবে দেখুন, কি ঘোর কলিই পড়েছে ! ওর দশ বৎসর বয়সে ওর বাপ মারা গেল। আমার ভগিনী আকৃকুটের মত ততবড় বাড়ীখানা আধা দামে বেচে, টাকাগুলো নিয়ে আর মেয়েকে নিয়ে আমারই স্কন্ধে এসে চাপলেন। এক বৎসর পরে সেও মারা গেল। তার পর থেকে বিবাহের রাত্রি পর্য্যন্ত মেয়েটার সকল ভারই আমরা নিয়েছিলাম।

আমি। তিনি তাঁর এক ছেলেকে নিয়ে কলকাতা এসেছেন। কিন্তু বিপদে পড়েছেন।

ভদ্রলোক। তা পড়ুন। এখন আমি একটা শুভ কর্ম্মে যাচ্ছি, এখন কাকেও বিপদ থেকে উদ্ধার করবার ফুরসুত আমার নেই।

আমি। তিনি যে গাড়ীতে চড়ে হাওড়া ষ্টেশন থেকে আপনার বাড়ীতে আসছিলেন, তার উপর একখানা মোটরগাড়ী এসে পড়ে। তাতে তিনি আর তাঁর ছেলে দুজনেই গুরুতর আঘাত পেয়েছেন।

ভদ্রলোক। মশায় এখনও বালক। কিন্তু আমরা বুড়ো

হয়েছি ; আমরা অনেক দেখেছি। আমরা বারবার দেখেছি যে, গুরুজনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়লে, একটা সাজা পেতেই হয়।

আমি। তাঁদের অজ্ঞান অবস্থায়, আপনার ঠিকানা জানতে না পারায়, আমরা তাঁদিকে মেডিক্যাল কলেজ হাঁসপাতালে নিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।

ভদ্রলোক। বেশ করেছেন। এই বিয়ে বাড়ীতে তাদিগকে ঢোকালে ঝঞ্ঝাটের একশেষ হত।

আমি। সেখানে তাঁদের চিকিৎসা কি যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।

ভদ্রলোক। না; অত ওষুধ, আর অত ডাক্তার ত আর কোথাও নেই।

আমি। আপনি কি এখন একবার সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখে আসবেন না ?

ভদ্রলোক। আমি ? আমি সেখানে যাব ? আপনি কি ইচ্ছা করেন যে আমি দেরীতে পৌঁছে বিবাহের লগ্নটা ভ্রষ্ট করে দিই ?

আমি। লগ্ন ভ্রষ্ট হবার কোনও ভয় নেই। এই গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে ; এতে চড়ে আপনি যদি প্রথমে মেডিকেল কলেজে গিয়ে পরে হাওড়া যান, তা হলেও ছ'টার গাড়ী ধরবার কোন ব্যাঘাত হবে না।

ভদ্রলোক। এই সময় মেডিক্যাল কলেজে যাব ? আমার ঘাড়ে ত ভূত চাপেনি। চল হে চল, গাড়ীতে উঠে পড়। অনর্থক

দেরী হয়ে গেল। ওহে পরামাণিক! তুমি এই বরের গাড়ীর কোচবাক্সে বস।

সেই হৃদয়হীন লোকের সহিত বাক্যবিনিময় করিলে কোনও ফল প্রাপ্তির আশা নাই বুঝিয়া, আমি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। ভদ্রলোকগণ হাওড়া অভিমুখে চলিয়া যাইলে, আমি মনে করিলাম যে গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়া বাড়ীটা একবার চিনিয়া আসিতে হইবে; কি জানি, যদি কিছু আবশ্যক হয়।

গলিতে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম, উহা ৯৬ নম্বর বাটীর কেবল মাত্র প্রবেশ পথই নহে, অন্ধকার রাত্রে নৈশ পথিকগণ উহা অন্য উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করিয়া থাকে। বাটীর নিকটে যাইয়া দেখিলাম যে উহা পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য উচ্চ বাটীর দ্বারা এরূপ সমাচ্ছন্ন যে, আমার নিশ্বাস-বায়ুর ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। বাটীর অবস্থা দেখিয়া উহার ভিতরে ঢুকিতে আমার সাহস হইল না।

বাড়ীতে ফিরিয়া একবার মনে করিলাম যে মাতুলের সংবাদ আহতগণকে প্রদান করিয়া আসি। কিন্তু পরক্ষণে বুঝিলাম যে, এইরূপ অপ্রীতিকর সংবাদ রোগীদিগের পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হইবে না। পরে অন্য কোনও দিন সে সংবাদ প্রদান করিলেই চলিবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আবার প্রমীলা।

পরদিন জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আদালত বন্ধ ছিল। আমি আহারাদির পর, মেডিক্যাল কলেজে রোগীদিগকে দেখিতে গেলাম। বিধবার পুত্রের সামান্য জ্বর হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য অবস্থা অনেক ভাল দেখিলাম। সে আমার সহিত ধীরভাবে অনেক কথা কহিল। সে কাহার নিকট শুনিয়াছিল যে, আমিই তাহাদিগকে রাস্তায় মৃতবৎ পতিত দেখিয়া চিকিৎসার জন্য হাঁসপাতালে লইয়া আসিয়াছিলাম। সে জন্যে সে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

যুবককে দেখিয়া আমি তাহার বিধবা মাতাকে দেখিবার জন্য তাঁহার পৃথক কক্ষে প্রবেশ করিলাম। তাঁহার মুখমণ্ডলের প্রায় সমুদায় অংশ পূর্ব্বদিনের ন্যায় বস্ত্রখণ্ডে আবৃত ছিল। কিন্তু তিনি শয্যার উপর উঠিয়া বসিতে পারিয়াছিলেন। আমার সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল না; সুতরাং আমাকে তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তিনি বসনাঞ্চল দ্বারা আপন মস্তক আবৃত করিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ লজ্জা-সঙ্কুচিতা দেখিয়া আমি বলিলাম, "আপনি বিশ্রাম করুন; আমি বাইরে যাচ্চি। সেখানে ডাক্তার-দের জিজ্ঞাসা করে আপনার শারীরিক অবস্থার কথা জেনে নিতে পারব।"

আমার কথা শুনিয়া, বিধবা যেন একটু চমকাইয়া উঠিলেন। পরে আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, "দাঁড়াও, যেও না। তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমি আমার সেবিকার মুখে শুনেছি যে, কোনও ভদ্রলোক রাস্তায় আমাদিকে জখম দেখে হাঁসপাতালে রেখে গিয়েছেন। সে কি তুমি?"

বিধবার বাক্যপ্রাণালী দেখিয়া আমার মনে হইল, তিনি যেন আমার সহিত কতকটা পরিচিতের ন্যায় কথা কহিতেছেন। তাঁহার প্রশ্নের উত্তর আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, আমিই আপনাদিকে বিপন্ন দেখে এখানে রেখে গিয়েছিলাম। কিন্তু আপনি কি আমাকে চেনেন?"

বিধবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর, তুমি কি আমাকে চেন না?"

আমি বলিলাম, "না, আমি আপনাকে পূর্ব্বে কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।"

বিধবা তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা আমাকে যেন বিদ্ধ করিয়া কহিলেন, "তুমি পুরুষের উপযুক্ত কথাই বলেছ। কিন্তু তুমি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন কোর না। আমি বয়সে তোমার চেয়ে অনেক ছোট; আমার বয়স একুশ বছর মাত্র।"

আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম; ভাবিলাম এই বিধবার বয়স একবিংশ বৎসর হওয়া কোন ক্রমে সম্ভবপর নহে। পুত্রকে গর্ভে ধরিয়া জন্মগ্রহণ না করিলে, কোন পুত্রবতীই আপন পুত্রের সমবয়স্কা হইতে পারে না। আমি বলিলাম, "কিন্তু আমি আপনার ছেলেকেই প্রায় ঐ বয়সী মনে করেছিলাম।"

বিধবা কহিলেন, "সে আমার চেয়ে এক বছরের বড়। সে আমার সতীনের ছেলে। তার আরও দুটি বড় ভাই আছে। কিন্তু সেই আমার ছোট ছেলে; তাকে আমি সব চেয়ে বেশী ভালবাসি; এখন সেই আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন। তুমি দয়া করে তার জীবন রক্ষা করেছ বলে, আমি চিরকাল তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু আমাকে কেন তুমি আবার দেখা দিলে? আমাকে কেন বাঁচালে? যে জীবনের সমস্ত সুখ তোমার হাতে নষ্ট হয়েছে, তোমারই হাতে সেই দুঃখময় জীবন কেন রক্ষা করলে?"

আমি বলিলাম, "আপনি কি বলছেন আমি বুঝতে পারছি না। আপনি কে, আমাকে পরিচয় না দিলে আমি কি করে বুঝব?"

বিধবা কহিলেন, "আশ্চর্য! আশ্চর্য্য! আজ তুমি আমাকে চিনতেই পারছ না। তুমিই একদিন আদরে আমার সর্ব্বাঙ্গ ড়বিয়ে দিয়েছিলে।"

আমি বলিলাম, "আপনি অন্যায় কথা বলছেন। আপনি হয়ত আমাকে অন্য কেউ মনে করেছেন। আমি আমার স্ত্রী ছাড়া, অন্য কোনও স্ত্রীলোককে কখনও আদর করি নি।"

বিধবা। তুমি মনে করে' দেখ, বিবাহের পর দিন গাড়ীর অন্ধকারে বসে কি করেছিলে।

আমি। ওঃ মনে পড়েছে। তুমি প্রমীলা? তোমার মুখ কাপড় দিয়ে বাঁধা রয়েছে বলে এতক্ষণ তোমায় চিনতে পারি নি।

বিধবা। হ্যাঁ আমি প্রমীলা; আর তুমি রতনপুরের—

আমি। তুমি এখনও সেই ভুলটার কথা মনে করে রেখেছ? তার পর, আমার ত সে কথা আর মনেই ছিল না।

বিধবা। কেন থাকবে? তোমরা যে পুরুষ মানুষ। তোমরা কোন্ দিন কোথায় কাকে একটু দয়া করে' আদর করলে, তা কি তোমরা মনে করে' রাখ?

আমি। তুমি ত জান যে তোমাকে আমি আপন স্ত্রী মনে করেই সেই রকম ব্যবহার করেছিলাম।

বিধবা। আমিও—তোমাকে সত্যি বলছি—আপন স্বামীর আদর মনে করে তা গ্রহণ করেছিলাম। আমি জানতাম যে একজন বুড়োর সঙ্গে আমার বিয়ে হচ্চে। কিন্তু ছ'বছর আগে, গাড়ীর অন্ধকারে, তোমার আদরকে তাঁর আদর মনে করে ভেবেছিলাম যে তিনি তত বুড়ো হন নি, আর তিনি আমাকে তখনই খুব ভালবেসেছেন। তার পর, তোমাদের বাড়ীতে গিয়ে যখন বুঝতে পারলাম যে, তুমি আমার স্বামী নও, তখন লজ্জায় মরে গেলাম।—পায়ের তলা থেকে যেন পৃথিবী সরে গেল; সাপের বিষে যেন সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। মনে করলাম, সেই লজ্জার কথা ভুলে যাব। কিন্তু পারলাম না;—বিধাতা কেন আমাদিকে মেয়েমানুষের মন দিয়ে সৃষ্টি করেছেন? আমরা কেন এতটুকু আদরের কথা ভুলতে পারি নে? প্রাণপণ স্বামী-সেবায় তা ভুলতে চেষ্টা করলাম, তাঁর ছেলেদের সমস্ত ভার নিজ হাতে নিয়ে তা ভুলতে চেষ্টা করলাম; শেষ কাশীতে এসে বিশ্বেশ্বরের পূজায় তা ভুলতে চেষ্টা করলাম; কিন্তু আমার সব চেষ্টাই বিফল হল।

তোমার সেই লজ্জাহীন আদর, ঘৃণ্য ব্যাধির মত আমার সর্ব্বাঙ্গ জর্জ্জরিত করে দিয়েছিল। এই ঘৃণ্য ব্যাধি বুকে নিয়ে মনে করেছিলাম যে, যদি কখন তোমার সঙ্গে দেখা হয়, তা হলে, তোমাকে জিজ্ঞাসা করব যে আমি তোমার কি অনিষ্ট করেছিলাম যার জন্যে তুমি আমার সমস্ত জীবন বিষাক্ত করে দিলে? তোমার কাছে আমি কি অপরাধ করেছিলাম, যার জন্যে তুমি আমার বুকের মাঝখানে, চির দিনের মত, মহালজ্জার ছাপ দিয়ে দিলে?

আমি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর। ভুলের বশে যা করেছি তার জন্যে আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

বিধবা। ক্ষমা? এ জীবনে তোমাকে ক্ষমা করতে পারব না। যে জীবন তুমি শুষ্ক করে দিয়েছ, তা নিংড়োলেও এতটুকু ক্ষমা বেরোবে না। যাকে ক্ষমা করব না, সেই আমার জীবন রক্ষাকর্ত্তা হল বলে—তারই নিষ্ঠুর হাতে এ তিক্ত জীবন রক্ষা হল বলে—আমি লজ্জায় ক্ষোভে মরে যাচ্চি। কিন্তু তোমাকে আমার এই কথাগুলো বলবার সুযোগ ঘটায়, আমি মনে মনে কতকটা তৃপ্তি লাভও করেছি। আজ তোমার কাছে আমার ছুটি প্রার্থনা আছে। বল, পূর্ণ করবে?

আমি। আমার সাধ্যাতীত না হলে, তুমি যা বলবে তা অবশ্যই পালন করব।

বিধবা। আমার প্রথম প্রার্থনা যে, তুমি আর কখনও আমাকে দেখা দিও না। পাপ—পাপ! তোমাকে দেখবার আগে, কাল জখম হয়ে আমি জন্মের মত চক্ষুহীন হলাম না কেন?

আবার দগ্ধ করবার জন্য ক্রুর নিষ্ঠুর তুমি, কেন আবার আমার সমুখে রূপের আগুন জ্বেলে দেখা দিলে? যাও, চলে' যাও—আর কখনও দেখা দিও না।

আমি। তোমার ইচ্ছা মতই কায করিব। তোমার দ্বিতীয় প্রার্থনা কি?

বিধবা। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, তুমি আমাদের নাম গোপন রেখে, আমার জীবনের এই ঘটনাটা লিখে জনসমাজে প্রচার করবে। এই কাহিনী সংসারে প্রচার হলে, পৃথিবীর লোকে বুঝবে যে, পুরুষের পক্ষে যা সামান্য ভ্রান্তি মাত্র, স্ত্রীলোকের পক্ষে তার পরিণাম কি ভয়ানক!

আমি প্রমীলার প্রথম প্রার্থনা এযাবৎ বৎসরের পর বৎসর পূর্ণ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে, বহু বৎসর পরে, তাহার দ্বিতীয় প্রার্থনাটিও পূর্ণ করিলাম।

সত্যের জয়

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাত্র মনোনয়ন।

বিবাহযোগ্যা কন্যার জন্য কোনও স্থানে সুপাত্রের অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া, দরিদ্র তারকনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বগ্রাম হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া, অবশেষে পাত্রের সন্ধানে মহেশপুরে রঘুনাথ মুখোপধ্যায়ের বাটীতে আসিয়াছিলেন। রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় নিকটবর্ত্তী রেল ষ্টেশন হইতে প্রত্যহ কলিকাতায় যাইয়া কোনও সদাগরি আফিসে চাকুরী করিতেন; এবং এইরূপে চাকুরী ও পৈতৃক গৃহসম্পত্তি দুই-ই রক্ষা করিতে পারিতেন। রঘুনাথ বাবুর তিন পুত্র; বড়টির বয়স বাইশ বৎসর; সে এক বৎসর পূর্ব্বে মহেশপুরের জমীদারদিগের স্কুল হইতে ম্যাট্রিকুলেসন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, চাকুরীর চেষ্টায় পিতার সহিত কলিকাতায় আনাগোনা করিতেছে। তাহারই উপর কন্যাদায়গ্রস্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হইল।

পাত্রের রূপ উপন্যাসের নায়কের মত না হইলেও, তাহাকে দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের পছন্দ হইয়াছিল। অন্য কোনও স্থানে তিনি এমন সুপাত্রের সন্ধান পান নাই। কিন্তু তিনি সসঙ্কোচে

চিন্তা করিলেন যে, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের অবস্থা ভাল, কলিকাতায় চাকুরী করিয়া মাসে মাসে আশী টাকা বেতন পান। তাহার উপর উপরিপাওনা, দেশে পাকা দ্বিতল গৃহ ও চাষবাস আছে। এরূপ অবস্থাপন্ন লোক কি অল্প অর্থ লইয়া, পাশকরা পুত্রের বধূরূপে তাঁহার কন্যাকে গ্রহণ করিবেন?

কিন্তু রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়, অন্যান্য কুলীন চূড়ামণিগণের ন্যায় পুত্রের বিবাহ দিয়া ধনবান হইবার আশা করিতেন না। ইহা ছাড়া এতদঞ্চলের সর্ব্বসাধারণের ন্যায়, তিনি সুপণ্ডিত বিদ্যারত্ন মহাশয়কে অতিশয় ভক্তি করিতেন। সর্ব্বোপরি, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সুশীলা, সুরূপা এবং সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা কন্যাটিকে দেখিয়া, তাঁহার অত্যন্ত পছন্দ হইয়াছিল; ভাবিয়াছিলেন, এমন লক্ষ্মী-শ্রীসম্পন্না কন্যাকে বাটীতে আনিতে পারিলে, তাঁহার গৃহে চিরদিন লক্ষ্মীশ্রী অক্ষুণ্ণ থাকিবে। অতএব বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে তিনি কহিলেন, "আমি দু'হাজার পাঁচ হাজার কিছুই চাইনে; তবে আমরা কুলীন, ছেলেও পাশকরা, শীগ্‌গির একটা চল্লিশ টাকা মাইনের চাকরীও পাবে। এমন ছেলের জন্যে সামান্য কিছু খরচ আপনাকে করতে হবে বৈকি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কিছু আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি পরিমাণ খরচ করলে এই কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাব?"

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় কহিলেন, "দেখুন, আমি বেশী কিছু চাইনে। সর্ব্বসমেত হাজার টাকা দিতে পারলেই, আমি আপনার মেয়ের সঙ্গে আমার ছেলের বিবাহ দেব। পাঁচশ

নগদ দেবেন, তিনশ টাকার গহনা দেবেন, আর বরাভরণ ফুল-শয্যা ইত্যাদিতে দুশো টাকা খরচ করবেন। আমি কি কিছু অন্যায় প্রস্তাব করলাম ?”

বিদ্যারত্ন মহাশয় বিবেচনা করিয়া কহিলেন, “না, আজ-কালকার দিনে আপনার প্রস্তাবটা কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়। আপনি যা চাচ্চেন, তা অতি সামান্যই বলতে হবে। কিন্তু আমার পক্ষে এই সামান্য টাকাও সংগ্রহ করা কঠিন হবে। যাই হোক, একবার শিষ্য যজমানদের ধরে দেখবো ; যদি টাকটা সংগ্রহ করতে পারি, পনের কুড়ি দিনের মধ্যে আপনাকে সংবাদ দিব। আমার ইচ্ছে যে এই বৈশাখ মাসেই বিয়ে দিই। মেয়েটি একটু বড় হয়ে পড়েছে ; তাকে শীঘ্র পাত্রস্থ করতে না পারলে জনসমাজে নিন্দা হবে।”

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় কহিলেন, “বেশ, তা হলে ঐ হাজার টাকার কথাই ঠিক রইল। এখন, আপনার মত দেশমান্য ব্যক্তির পায়ের ধুলো যখন আমার মত সামান্য ব্যক্তির বাড়ীতে পড়েছে, তখন একটু মিষ্টি মুখ করে আমাকে কৃতার্থ করতে হবে।”

বিদ্যারত্ন মহাশয় বাটী হইতে স্নান আহ্নিক করিয়া আসিয়া-ছিলেন ; এ জন্য জলযোগ করিতে তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তিনি ভাবিয়া দেখিলেন যে, বেলা দেড় প্রহর অতীত হইয়াছে, তদ্দণ্ডে স্বীয় গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিতে না পারিলে, তিনি দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে বাটী ফিরিতে পারিবেন না। তিনি গৃহে

ফিরিয়া আহারাদি না করিলে, তাঁহার পত্নী জলবিন্দু মাত্র গ্রহণ করিবে না। অতএব রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের জলযোগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া মিনতির সহিত কহিলেন, "থাক্ থাক্, আজ আমাকে ক্ষমা করবেন, আজ আর জলযোগের উদ্যোগ করবেন না। বেলা হয়ে গেছে; এখন এখানে বিলম্ব করলে, বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে বাড়ী ফিরতে পারবো না।" এই বলিয়া, তিনি রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়কে নমস্কার করিয়া এবং তাঁহার প্রতিনমস্কার গ্রহণ করিয়া দ্রুতপদে বাটীর পথে ফিরিলেন। কিন্তু কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই পথিমধ্যে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মহেশপুরের জমিদার

মহেশপুরের জমীদারের নাম শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর। তিনি উচ্চশ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণ। তাঁহার সম্পত্তির বাৎসরিক আয় এক লক্ষ টাকারও অধিক। তাঁহার ন্যায় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত জমীদার সে অঞ্চলে বোধ হয় দ্বিতীয় ছিল না। তাঁহার দুরন্ত শাসনে প্রজা ও ভৃত্যবর্গ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, রায় বাহাদুর অনেক সদ্‌গুণেরও অধিকারী ছিলেন। তিনি দরিদ্রগণের প্রতি দানশীল, পুত্রের প্রতি স্নেহবান, পত্নীর প্রতি

প্রেমময়; কর্ত্তব্যতৎপর ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। গ্রাম্য বালকদিগের সুবিধার জন্য তিনি গ্রাম মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তৃষ্ণার্ত্ত প্রজাবর্গের জন্য তাঁহার বিস্তীর্ণ জমিদারীর নানাস্থানে সুপেয় সরোবর সকল খনন করাইয়াছিলেন। কিন্তু কলসীপূর্ণ দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্র পতিত হইলে তাহা যেমন অপবিত্র হইয়া যায়, তাঁহার তাবৎ সদ্গুণই তাঁহার একটি মহা-দোষে কলুষিত হইয়া গিয়াছিল;—তাঁহার সামান্য ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ যদি এতটুকু 'টু' শব্দ করিত, তিনি তাহা সহ্য করিতে পারিতেন না; যে দৈবক্রমে তাঁহার একটি কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করিত, তিনি তাহাকে অশেষ বিধানে নির্য্যাতন করিয়া তাঁহার দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বুঝাইয়া দিতেন

সম্প্রতি রায় বাহাদুরের এক পার্শ্বচর তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, ইংরাজ-রাজ তাঁহার নিকট হইতে কিস্তি কিস্তি মালগুজারি লইয়াই নিশ্চিন্ত; প্রকৃতপক্ষে তিনিই তাঁহার জমি-দারীর রাজা, রাজাই দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা এবং গো ব্রাহ্মণের রক্ষক। অতএব তাঁহার মুসলমান প্রজাগণ যাহাতে আগামী বক্রীদ উপলক্ষে গোজাতির ধ্বংসসাধন করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা তাঁহাকেই করিতে হইবে। তিনি হিন্দু এবং ব্রাহ্মণ, কাযেই প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি মহেশপুরের একজন গণ্যমান্য মুসলমান প্রজাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

মহম্মদ আলি সুশিক্ষিত ও ধনবান প্রজা। সে আসিয়া রায় বাহাদুরকে সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হুজুরের হুকুম?"

রায় বাহাদুর কহিলেন—দেখ মহম্মদ, তোমাকে এবার একটা কায করতে হবে। এই তোমাদের বক্‌রীদ আস্‌ছে; এই বক্‌রীদে আমার জমীদারীর ভিতর কোনও যায়গায় গরু-কোরবানি না হয়, তার ব্যবস্থা তোমাকে করতে হবে।"

মহম্মদ আলি মিনতির স্বরে কহিল, "হুজুর যেমন হুকুম করছেন, আমাদের গ্রামে আমি তা অনায়াসে করতে পারব; এ গ্রামের সব মুসলমান আমার কথায় হুজুরের হুকুম তামিল করবে। কিন্তু অন্য গ্রাম সম্বন্ধে আমি জবাবদিহি হতে পারব না। আর একটা কথা হুজুরকে নিবেদন করি। এখন এই বাঙ্গলা দেশে সকল মোসলমানই গরীব হয়ে গেছে; নবাব বাদশার জাত এখন খানসামাগিরি, ভিস্তিগিরি, আর বাবুর্চ্চিগিরি করে। অন্য দিকে দেশের জমীদারেরা চরাবার জন্যে মাঠ দেন না, গরুর চিকিচ্ছে করবার কোনই ব্যবস্থা রাখেন না; তাতে গরুগুলো না খেতে পেয়ে আর রোগে হাজার হাজার মরে যাচ্ছে; তাতে গরুর দামও অনেক বেড়ে গেছে; চাষ আবাদের জন্যে এখন গরু কেনা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেলা টাকা খরচ করে গরু কিনে কোরবানি করে, দেশে এমন মোসলমান কটা আছে হুজুর? একটা বকরি কেনবার পয়সা জোটে না—"

মহম্মদ আলির দীর্ঘ বাক্য শুনিয়া রায় বাহাদুর ঈষৎ ক্রুদ্ধ হইলেন। কহিলেন, "তোমার কথা বন্ধ কর। তোমার কাছে বক্তৃতা শোনবার জন্যে তোমাকে আমি ডাকিনি। আমি যা হুকুম করেছি, তা করবে কি না?"

রায় বাহাদুরের কড়া কথায় মহম্মদ আলি একটু অপমান বোধ করিল; সে কুক্ষণে কহিল, "হুজুর, আগেই ত বলেছি যে অন্য গ্রাম সম্বন্ধে আপনার হুকুম তামিল করতে পারবো না।"

রায় বাহাদুর আরও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, "আমি জমীদার, রাজা, আমার হুকুম! তামিল করতেই হবে। আমার কাছে তোমার হারামজাদি খাটবে না।"

অকারণ অপমানকর গালাগালি শুনিয়া মহম্মদ আলির মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সে উদ্ধত কণ্ঠে কহিল, "খবরদার হুজুর, ইজ্জৎ রেখে কথা বলবেন!"

রায় বাহাদুর রক্তবর্ণ চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া কহিলেন, "কি? আমি জমীদার, রাজা, আমাকে চোখ রাঙিয়ে কথা কও? জান না, পাজি, তুমি এখনও আমারই জমীতে বাস করো।"

মহম্মদ আলি শুনাইয়া দিল, "অমনি নয়, খাজানা দিয়ে বাস করি। আমার বাপ দাদা আপনার বাপ দাদাকে অনেক টাকা সেলামি দিয়ে পাট্টা নিয়েছিল।"

তালপত্রের অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। রায়বাহাদুর লম্ফ দিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন; চীৎকার করিয়া কহিলেন, "চোপ রও! পাজি হারামজাদ্, শূয়ারকা বাচ্চা!"

মহম্মদ আলি আর সহ্য করিতে পারিল না; তাহার সর্ব্বাঙ্গে মুসলান রক্ত প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। সে তীব্র ভাষায় জমীদারকে গালাগালি দিল। তার পর জমীদারের ভৃত্যবর্গের হস্ত হইতে

আত্মরক্ষা করিবার জন্য, সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া নিম্নতলে নামিয়া ফটকের দিকে ছুটিল।

ক্রোধান্ধ জমীদারের হুকুমে ফটকের নিকট পলায়নপর মহম্মদ আলি ধৃত হইল; এবং তাঁহার হুকুমে অজস্র পাদুকা-প্রহারে ভূতলশায়ী হইল; অধিকন্তু তাঁহার আদেশে, তাঁহার নীচ জাতীয় পাইকগণ তাহার মুখে বার বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সংসার

ক্ষণিক ক্রোধের বিষময় ফল যখন ফলিতেছিল, তখন পণ্ডিতবর তারকনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় কন্যার জন্য পাত্র মনোনয়ন করিয়া, জমীদার বাটীর ফটকের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া বাটী ফিরিতেছিলেন। সেই বীভৎস কাণ্ড দেখিয়া তিনি স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর উৎপীড়িত মুসলমানের পীড়নে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তবেগে জমীদার বাবুর নিকটে আসিলেন।

রায় বাহাদুর বিদ্যারত্ন মহাশয়কে চিনিতেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ও রায় বাহাদুরকে চিনিতেন; কতবার পণ্ডিত বিদয়ে তাঁহার বাটীতে আহূত হইয়া উপহার লইয়া গিয়াছেন। এক্ষণে ক্রোধোন্মত্ত রায় বাহাদুর সমীপাগত বিদ্যারত্ন মহাশয়কে লক্ষ্য করিলেন না; তারস্বরে পাইকগণকে কহিলেন—"মার্, মার্, আরও মার্! দে, হারামজাদার মুখ একবারে ভেঙ্গে দে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় রায় বাহাদুরের দুই হস্ত ধারণ করিয়া কাতর স্বরে কহিলেন—"আহা! আহা! ক্ষান্ত হোন। নিবারণ করুন। লোকটা যে মারা যাবে।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কথা শুনিয়া, যে লোকগুলা মহম্মদ আলিকে প্রহার করিতেছিল, তাহাদের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। তাহারা মনে করিল যে লোকটা যদি সত্যই মরিয়া যায়, তবে তাহারা নিশ্চয় খুনের জন্য দায়ী হইবে; এবং হয়ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইবে। অতএব তাহারা প্রহারে বিরত হইল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় মৃতপ্রায় মহম্মদ আলিকে ধরিয়া তুলিলেন।

রায় বাহাদুর গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, "এখানে তুমি কেন? এখানে ত পণ্ডিত বিদায় হচ্ছে না। আমি প্রজাশাসন করছি, তাতে তুমি হস্তক্ষেপ করবার কে?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি মহম্মদ আলিকে ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার বাটীতে পৌঁছাইয়া দিলেন। পরে আপন গ্রামাভিমুখে চলিলেন। তিনি গৃহে প্রত্যাগমন না করিলে সেই দারুণ গ্রীষ্মে গৃহিণী জলবিন্দুমাত্র গ্রহণ করিবেন না, এই ভাবনায় অস্থির হইয়া, বারবার আপন পদপ্রান্তে পতিত ছায়ার দিকে চাহিয়া সময়ানুমান করিয়া, অতি দ্রুতপদে অগ্রসর হইলেন।

বাঁশফুলি নামক গ্রামে বিদ্যারত্ন মহাশয় পুরুষানুক্রমে বাস করিতেন। বেলা প্রায় আড়াইটার সময় তিনি বাঁশফুলি গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন।

সেখানে তাঁহার তৃণাচ্ছাদিত রন্ধনগৃহের মৃন্ময় দাবায় বসিয়া, তাঁহার গৃহিণী একটি কুলার উপর বিস্তৃত দাল হইতে একটি একটী করিয়া আবর্জ্জনাকণা বাছিয়া ফেলিতেছিলেন ; তাঁহার নিকটে বসিয়া, তাঁহার ত্রয়োদশবর্ষীয়া কন্যা সুমুখী, কড়ি ও ওলা নামক দশম ও অষ্টম বর্ষ বয়স্ক ভাই দুটিকে, বঁটী পাতিয়া কাঁচা আম ছাড়াইয়া দিতেছিল ; তাহারা আপন আপন বাম হস্তে লবণ লইয়া লবণ সংযোগে আম্রখণ্ডগুলি নানারূপ মুখভঙ্গী সহকারে চর্ব্বণ করিতেছিল। সেই উচ্চ দাবার নিম্নে একটি যুঁইফুলের গাছ হইতে রৌদ্রতাপে অসংখ্য জুঁইফুলের পাপড়ি সকল শেষ সুবাস বিতরণ করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

বিদ্যারত্ন মহাশয় গৃহপ্রবেশ করিয়া গৃহিণীর উদ্দেশ্যে প্রাঙ্গণ হইতে হাঁকিলেন—"কই গো, তোমরা কোথায় গেলে ?"

গৃহিণী কুলা ও দাল ত্বরিত হস্তে বাঁশের শাঙার উপর উঠাইয়া রাখিয়া, দ্রুতপদে প্রাঙ্গণে নামিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল নেত্রে স্বামীর দিকে চাহিয়া মিষ্ট মুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,"কেমন, খবর ভাল ত ?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় পত্নীর প্রফুল্ল মুখের দিকে মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, খবর ভাল। পাত্রটি—"

গৃহিণী বাধা দিয়া কহিলেন, "সে কথা পরে শুনব এখন। বড় ঘরের দাওয়ায় চল ; সেখানে মাদুর বিছিয়ে রেখেছি, বসবে ; সুমুখী বাতাস করবে। কি ঘেমেছ !—গায়ে যেন বর্ষার ধারা বয়ে যাচ্ছে। এস, এস, বসবে। আমি ভাত বেড়ে বড় ঘরের দাওয়াতেই নিয়ে যাব এখন। এস।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন, "না আমাকে মুসলমান বাড়ীতে যেতে হয়েছিল। কাপড় চাদর না কেচে, আর একটা ডুব না দিয়ে ঘরে ঢুকবো না।"

সুমুখী মাতার নির্দ্দেশ মত, তালবৃন্ত লইয়া পিতাকে ব্যজন করিতে আসিয়াছিল। সে ব্যজন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, তেল এনে দেব কি?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন, "না, সকালবেলা তেল মেখে স্নান করেছি; এখন আবার তেল মাখবো না। আর এই ঘামের উপর তেল মাখ্‌লে আটার মত জড়িয়ে যাবে।" অতঃপর পুত্রদ্বয়ের সন্ধানে চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁরে সুমুখী, কড়ি আর ওলা কোথায় গেল রে?"

পিতার প্রশ্ন শুনিয়া রান্নাঘরের দাবা হইতে ওলা উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "এই যে, বাবা! আমরা এখানে এই রান্নাঘরের দাবায় বসে আম খাচ্ছি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় রান্নাঘরের দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইয়া স্নেহপূর্ণ নয়নে নন্দনদ্বয়ের ললিত অবয়ব অবলোকন করিয়া আনন্দলাভ করিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তোরা আম কোথা পেলি রে?"

ওলা বলিল, "দাদা মুখুয্যে কাকার গাছ থেকে পেড়েছিল।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় বিস্মিত হইয়া কড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সর্ব্বনাশ! এমন কায কেন করলি?"

গৃহিণী নিকটে ছিলেন; তিনি স্বামীর দিকে চাহিয়া কুণ্ঠিত

কণ্ঠে কহিলেন, "না, না, কিছু অন্যায় করে নি। আমাকে এসে বল্লে, মা, মুখুয্যে কাকার গাছে আমগুলো বড় বড় হয়েছে, মুখুয্যে কাকাকে বলে' চারটে পেড়ে নিয়ে আসব? আমি বল্লাম যাও, কিন্তু না বলে' পেড়ো না, আর চারটির বেশী পেড়ো না। তাই গিয়েছিল। আর মুখুয্যে ঠাকুরপো আরও বেশী নিতে বল্লেও, চারটির বেশী নেয় নি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন, "তোমার অনুমতি নিয়ে কাষ করলেও, এ কাষটা ভাল হয় নি। আমি তোমাকে কতটা শ্রদ্ধা করি, তাত তুমি জান, গিন্নি। তোমার গর্ভের ছেলে হয়ে, পরের গাছে আম ঝুলছে দেখে সে তা খাবার জন্যে লোভ করবে, এমন ত হতে পারে না। আজ আমের কথা বল্লে, কাল যদি এসে বলে, যে অমুকের গাইয়ের বাঁটে খুব দুধ রয়েছে, দুয়ে নিয়ে আসবো? তখন তুমি কি বলবে?"

গৃহিনী এতটুকু হইয়া বলিলেন, "কাষটা যে এমন অন্যায়, তা আগে আমি বুঝতে পারি নি। আমার ছেলেরা এমন অন্যায় কাষ আর কখনও করবে না। আজ তুমি আমাদের দোষ নিও না।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কাহারও দোষ গ্রহণ করেন নাই। বরং ভাবিয়াছিলেন, যাহার এমন কর্ত্তব্যময়ী গৃহিনী, যাহার সুমুখীর মত সুরূপা ও সুশীলা কন্যা, যাহার কড়ি ও ভলার ন্যায় সুবোধ পুত্র, তাহার সংসার সংসার নহে,—পৃথিবীতে ত্রিদিবের প্রতিবিম্ব।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অর্থের অন্বেষণ

স্নানান্তে ধৌত উত্তরীয় ও বস্ত্র আতপতাপে শুষ্ক করিবার জন্য কন্যা সুমুখীর হস্তে প্রদান করিয়া, বিদ্যারত্ন মহাশয় বেলা তিন প্রহরের সময় আহার করিতে বসিলেন।

গৃহিণী পার্শ্বে বসিয়া ব্যজন করিতে করিতে মুগ্ধনেত্রে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অতি বৃহৎ ললাটের শোভা দেখিতে লাগিলেন; দেখিলেন, তাহাতে দুশ্চিন্তার একটি মাত্র রেখা পতিত হয় নাই; দেখিলেন, কি শান্ত জ্ঞানময় স্বামী তিনি লাভ করিয়াছেন; তাঁহার মত ভাগ্যবতী এ পৃথিবীতে আর কে আছে?—কে অমন স্বামী, অমন কন্যা, অমন পুত্র লাভ করিতে পারিয়াছে? হঠাৎ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দৃষ্টি তাঁহার দৃষ্টির সহিত মিলিত হওয়ায় তাঁহার ভাবনার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল; তাঁহার সুন্দর আনন অনুরাগরাগে ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া পড়িল। কতক্ষণ পরে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আহার অর্দ্ধ সমাপ্ত হইলে, তিনি স্বামীকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁগা, যে পাত্রটি দেখে এলে, তার বয়স কত?"

বিদ্যারত্ন মশায় কহিলেন, "পাত্রটির বয়স বেশী নয়, একুশ কি বাইশ বছর হবে। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। আর

লেখাপড়াও জানে, একটা পাশ করেছে; চাকরীর চেষ্টা করছে। পাত্রের বাপের অবস্থা স্বচ্ছল,—চাষবাস, বাগান পুকুর, পাকা দোতালা বাড়ী সবই আছে। সেখানে যদি সুমুখীর বিয়ে হয়, তা হলে খুব সুখেই থাকবে।"

বিধাতা সুমুখীকে ঐশ্বর্য্যশালিনী করিবার জন্য যে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা স্বপ্নেও হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া গৃহিণী মনে করিলেন যে, স্বামী পাত্রের অবস্থা যেরূপ বর্ণনা করিলেন, সেই অবস্থাতে কন্যা নিশ্চয় চিরসুখিনী হইবে। অতএব তিনি ভোজনরত স্বামীকে কহিলেন, "সুমুখীর জন্মের লগ্ন দেখে তুমি ত আগেই বলেছিলে যে ও চিরসুখিনী হবে। তা, আমার মনে হচ্ছে, সেখানেই ওর বিয়ে হবে। তবে তাঁরা যদি অনেক টাকা নগদ চান, তা হলে কি হবে বলা যায় না।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় তখন নগদে গহনায় যাহা বরপক্ষকে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিলেন।

গৃহিণী। দেখ, এই গহনার জন্যে তোমার কিছুই ভাবতে হবে না। আমার এই বালা আছে, আর হার আছে। এই দুটো গহনা ভাঙলেই বারো তেরো ভরি সোণা পাওয়া যাবে; তাতে সুমুখীর হার, বালা, আর অনন্ত হবে। আর ওর কাণে পাশী মাকড়ী আর নলক ত আছেই। তা ছাড়া আমার বাক্সে পণ্ডিত বিদায়ে পাওয়া ক'টুকরো রূপো আছে; তাও পনেরো ষোল ভরি হবে। তাতে ওর পায়ের মল হয়ে যাবে।

বিদ্যারত্ন। তোমাকে আমি এখন এক টুকরো সোণা দিতে

পারি নি ; এখন তোমার বাপের দেওয়া গহনা আমি তোমার গা থেকে খুলে নিতে পারবো না।

গৃহিণী। কেন পারবে না? আমাকে যে তুমি নিয়েছ! আমি, আমার ছেলে মেয়ে, সর্ব্বস্ব যে তোমার। আমাদের চেয়ে ত দুচার ভরি সোণা বেশী নয়? তা' ছাড়া, আমার মেয়ে ; তার গা সাজাবার জন্যে আমি যদি তাকে দু'চার ভরি সোণা দি, তুমি ত তা বারণ করতে পার না।

বিদ্যারত্ন। না, বারণ করব না ; তুমি দিও। এই গহনা ছাড়া দানসামগ্রী, বরাভরণ ও ফুলশয্যাতে আরও দুশো টাকা খরচ করতে হবে। এই দুশো টাকা একটু চেষ্টা করলে আমি অনায়াসে সংগ্রহ করতে পারবো।

গৃহিণী। আর বরযাত্রদের, আর আমাদের গ্রামের জনকত্তক ব্রাহ্মণকে খাওয়াতেও আরও একশো টাকা খরচ পড়বে।

বিদ্যারত্ন। তাও একরকম করে চলে যাবে। মুদীর দোকান থেকে ধারে জিনিষ পত্র নিয়ে, ক্রমে তা শোধ করলে চলবে। আমার ভাবনা কেবল ঐ নগদপাঁচশো টাকার জন্যে।

গৃহিণী। আমার মনে হচ্ছে তার জন্যেও তোমার ভাবতে হবে না। তোমার পঞ্চাশ ঘর শিষ্য আছে ; তারা প্রায় সকলেই অবস্থাপন্ন লোক। তারা প্রত্যেকে যদি দশটাকা হিসাবেও দেয়, তা'হলেও অক্লেশে তোমার পাঁচশো টাকা হয়ে যাবে। তুমি কালই তাদের সকলকে চিঠি লেখ।

বিদ্যারত্ন। চিঠি লিখলে চলবে না। কালই সকালে দুর্গানাম

করে' আমি নিজে বেড়িয়ে পড়বো। দশ বার দিন গ্রামে গ্রামে শিষ্যবাড়ী ঘুরে আমি এই চৈত্র মাসেই বাড়ী ফিরব। যদি ঐ টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি, তা হলে আগামী বৈশাখ মাসেই বিয়ে হয়ে যাবে।

গৃহিণী। তা টাকার যোগাড় হবেই ; আর ঐ থানেই ঐ বোশেখ মাসেই সুমুখীর বিয়ে হবে।

বিস্তারত্ন। আমার মনে কিন্তু ততটা সহজ বোধ হচ্ছে না। আমার প্রতি আমার শিষ্যদের খুব ভক্তি আছে বটে ; কিন্তু জান ত, তারা সব ছাঁপোষা লোক ; তার উপর, জিনিষপত্র দুর্ম্মল্য হওয়ায় সংসার চালানই দায় হয়ে পড়েছে। আমাকে পুজায় যে দু'পাঁচ টাকা বার্ষিক বরাদ্দ আছে, তাই দিয়ে উঠতে পারে না। এখন হঠাৎ এই বছরের শেষে, অতটা টাকা যে দিয়ে উঠতে পারবে, এমন মনে হয় না। তবে একবার চেষ্টা করে দেখা উচিত।

গৃহিণী। কালই আসবে কি ?

বিস্তারত্ন। হাঁ, কালই যেতে হবে। মিছামিছি দেরী করা হবে না ; এই মাসের মধ্যেই বাড়ী ফেরা আবশ্যক।

পর দিন প্রত্যূষেই গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া এবং সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, তাঁহার হস্তে পাঁচটি রজত মুদ্রা প্রদান করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিস্তারত্ন মহাশয় দুর্গানাম জপ করিতে করিতে গৃহ ত্যাগ করিলেন। গৃহিণী পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহদ্বারে গিয়া কতক্ষণ স্বামীর গমনপথের দিকে

উদাসনেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর, একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিষাদাচ্ছন্ন মুখে বাটীর মধ্যে ফিরিলেন; এবং নিত্যাচরিত গৃহকর্ম্মে মন দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ওলার পীড়া

বিদ্যারত্ন মহাশয় গৃহত্যাগ করিবার পরে গৃহিণী হঠাৎ কিছু বিচলিত হইয়া, গৃহের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন, কৈ তিনি ত প্রভাত হইতে একবারও ওলাকে দেখেন নাই। শুইবার ঘরের দাবার উপর মাদুর পাতিয়া, তাহাতে বসিয়া কড়ি এক মনে পাঠাভ্যাস করিতেছিল। কিন্তু কড়ির নিকট ওলা ছিল না। গৃহিণী কড়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে কড়ি, ওলা কোথায় গেল রে? তাকে ত সকাল বেলা থেকে দেখিনি।"

পূর্ব্বদিন পিতাকে আম পাড়ার কথা বলিয়া দিয়াছিল, এজন্য কড়ির মন ওলার প্রতি তত প্রসন্ন ছিল না। সুতরাং সে তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, "কি জানি, কোথায় গেছে। বোধ হয় এখনও বিছানাতে শুয়ে আছে।"

গৃহিণী কন্যাকে ডাকিয়া কহিলেন, "সুমুখী দেখ্‌ত, মা, এত বেলা হল, ওলা এখনও উঠল না কেন?" শয়ন গৃহে ওলাকে দেখিয়া আসিয়া সুমুখী বিহ্বল নেত্রে কহিল, "মা

ওলা বিছানাতেই শুয়ে রয়েছে। তার গা খুব গরম। এত ডাকলাম উত্তর দিলে না। তুমি একবার দেখবে এস।"

গৃহিণী উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিলেন, "ও মা, কি গেরো! তিনি বাড়ী থেকে বেরুতে না বেরুতে ছেলেটা জ্বরে পড়লো!" বলিতে বলিতে ছুটিয়া ওলার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। দেখিলেন, ওলা সম্পূর্ণ অচেতন অবস্থায় শয্যায় উপর পড়িয়া আছে। তাহার চক্ষুর্দ্বয় জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়াছে, তাহার অঙ্গের উত্তাপ যেন অগ্নিবর্ষণ করিতেছে। দেখিয়া তিনি অতিশয় ভীতা হইলেন। অকস্মাৎ পুত্রের এই কঠিন পীড়ায় কি কর্ত্তব্য তাহা সহসা স্থির করিতে পারিলে না। একবার ভাবিলেন, স্বামীর পশ্চাতে কোনও লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি কোন পথে কোথায় গিয়াছেন, তাহার ত নিশ্চয়তা নাই; আরও তিনি প্রায় দেড় ঘণ্টা পূর্ব্বে গৃহত্যাগ করিয়াছেন, এ সময় মধ্যে তিনি প্রায় আড়াই ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়াছেন, এখন তাঁহার অনুধাবন করিয়া কেহই তাঁহাকে ধরিতে পারিবে না। অতএব তাঁহাকে সংবাদ দিবার জন্য, তাঁহার অনুগমন করা বৃথা; আপন বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ীই পুত্রের পীড়ার প্রতীকার করিতে হইবে। কিন্তু ভৃত্য বা অন্য অভিভাবকাদি সহায়তাশূন্যা কুলবধূ, ত্রয়োদশবর্ষীয়া এক কন্যা ও দশম বর্ষীয় এক বালকের সহায়তায় কি করিবেন? গ্রামে ডাক্তার নাই, মহেশপুর হইতে ডাক্তার ডাকিয়া আনিতে হইবে; গ্রামে ঔষধালয় নাই, মহেশপুর হইতে ঔষধ আনিতে হইবে। দুই ক্রোশ পথ আনাগোনা করিয়া কে

এই সকল কায করিবে? গ্রামের কোন লোককে বলিলে বোধ এই বিপদের সময় কেহই তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পশ্চাৎপদ হইবে না;—সকলেই যে তাঁহাদের ভালবাসে। বোধ হয়, মুখুয্যে ঠাকুরপোকে বলিলেই, সে ডাক্তার ডাকিয়া দিবে, ঔষধ আনিয়া দিবে, আর অন্যান্য সমস্ত ব্যবস্থাই করিবে। কিন্তু অর্থ? পুত্রের চিকিৎসা ও পথ্য ক্রয় জন্য তিনি অর্থ কোথায় পাইবেন? তাঁহার হাতে তাঁহার স্বামী পাঁচটি টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা ত একবার ডাক্তার আসিলেই, আর একদিনকার ঔষধ পথ্যেই ব্যয় হইয়া যাইবে। তাহার পর আবার ডাক্তার আনিতে হইলে, আরও অর্থ তিনি কোথায় পাইবেন? তাঁহার মনে পড়িল, তাঁহার গায়ে গহনা আছে; সেই গহনা বন্ধক রাখিয়া অর্থ সংগ্রহ করিবেন এবং পুত্রের চিকিৎসা করাইবেন। তিনি স্বামীকে বলিয়াছিলেন যে, সেই গহনা বিবাহপোলক্ষে কন্যাকে দিবেন; কিন্তু সে বিবাহ পরে হইবে; তাহার আগে ত তাঁহার প্রাণাধিক পুত্রের জীবন! এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া, তিনি তাঁহার জেষ্ঠ্যপুত্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "কড়ি, বাবা, তুমি একবার তোমার মুখুয্যে কাকাকে ডেকে নিয়ে এস। বলো যে ওলার খুব অসুখ; আর তিনি বাড়ীতে নেই।"

দুই মিনিট পূর্ব্বে কড়ি ভ্রাতার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া পড়িতে বসিয়াছিল; এখন সে ভ্রাতার অসুখের কথা শুনিয়া, তাড়াতাড়ি পুস্তক তুলিয়া রাখিয়া, বিপন্নের ন্যায় মুখুয্যে কাকাকে ডাকিবার জন্য ছুটিল।

মুখুয্যে কাকা প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ, তাঁহার নাম রাখালদাস মুখোপাধ্যায়। বড় ভাই লেখাপড়া শিখিয়া, বিদেশে থাকিয়া চাকুরী করিত। সে লেখাপড়া না শিখিয়া বাড়ীতে থাকিয়া জমী জমা দেখিত, আর গ্রামের লোকের ফায়ফরমাস্ খাটিত; উৎসবে লুচি ভাজিত, কোমর বাঁধিয়া পরিবেষণ করিত; মৃত্যুতে শ্মশানে মৃতদেহ বহন করিতে ঘাড় পাতিয়া দিত। রাখালদাস আসিয়া ওলার গায়ে হাত দিয়া বলিল, "তাই ত বৌঠাকরুণ, জ্বরটা বড় বেশী; একবারে যে বেহুঁস হয়ে রয়েছে। একজন ডাক্তারকে ত ডাকা দরকার।"

গৃহিণী বিষণ্ন মুখে বলিলেন, "তাই ত তোমায় ডেকেছি, ঠাকুরপো। তিনি বাড়ী নেই; শিষ্যবাড়ী গেছেন। বাড়ী ফিরতে দশ বারদিন দেরী হবে। ডাক্তার ডাকা, ওষুধ আনা এসব তুমি না করলে আমার আর ত কোন ভরসা নেই ঠাকুরপো।"

রাখালদাস কহিল, "সে সব তোমার কিছু ভাবনা নেই। কোন্ ডাক্তারকে ডাকতে হবে বল, আমি এখনই ডেকে নিয়ে আস্ছি। মহেশপুরের কেদার ডাক্তার বেশ ভাল ডাক্তার; ভিজিট নেবে দু' টাকা, আর গাড়ীভাড়া নেবে দেড় টাকা, তাকেই ডেকে নিয়ে আসবো কি?"

গৃহিণী কহিলেন, "তুমি যাকে ভাল বিবেচনা কর তাকেই নিয়ে এসো।"

রাখালদাস গমনোদ্যত হইয়া কহিল, "তাকে ত আনবোই।

কিন্তু দৈবক্রমে যদি তার দেখা না পাই, তা হলে অন্য যাকে পাব তাকেই নিয়ে আসবো। ছেলেটার পেটে আজ দু' এক দাগ ওষুধ পড়া চাই।"

গৃহিণী এক প্রতিবেশিনীর নিকট তাঁহার স্বর্ণহার বন্ধক রাখিয়া এক শত টাকা ঋণ গ্রহণ করিলেন। মহেশপুর হইতে কেদার ডাক্তার প্রত্যহ আসিতে লাগিল, ঔষধ পথ্যের রীতিমত ব্যবস্থা হইল; সুমুখী ও গৃহিণী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দিবারাত্র সেবা করিতে লাগিলেন; কিন্তু ওলার রোগের উপশম হইল না। পঞ্চম দিনে তাহার রোগ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল দেখিয়া মহেশপুরের ডাক্তার কহিলেন, "রোগটি বড়ই কঠিন; অন্য একজন ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করা দরকার। আপনারা জেলা থেকে একজন ভাল ডাক্তার আনবার ব্যবস্থা করুন।"

জেলা হইতে একবার ডাক্তার আনিতে হইলে, পাথেয় ও দর্শনীতে ষাট পঁয়ষট্টি মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে। গৃহিণী আপনার হাতের বালার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তাই হবে।" তিনি বালা বন্ধক রাখিয়া আবার ঋণ গ্রহণ করিলেন। রাখালদাস জেলা হইতে ডাক্তার লইয়া আসিল। মহেশপুরের ডাক্তারও দুই বেলা আসিয়া দেখিতে লাগিলেন। ওলার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইল।

কয়েকদিন কিছু ভাল থাকিয়া, একাদশ দিবসে ওলার রোগ আবার অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল। মহেশপুরের ডাক্তার বলিলেন, "আবার জেলা থেকে ডাক্তার আনতে হবে।"

আনিতে ত হইবে! কিন্তু আর অর্থ কোথায়? দয়াময়, তোমার করুণার রাজ্যে দুঃখিনী মাতা কি আপনার চক্ষের সম্মুখে আপন পুত্রকে, আপন বক্ষের নিধিকে, আপন প্রাণাধিক প্রাণকে বিনা চিকিৎসায় মরিতে দেখিবেন?

দুঃখিনীর অর্থ নাই, অর্থ সংগ্রহের উপায় নাই;—না থাক; তুমি দয়াময়, তোমার অনন্ত দয়ার ভাণ্ডার ত শূন্য হইয়া যায় নাই!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কন্যাদায়।

না, তোমরা বিশ্বাস কর, ভগবানের অসীম দয়ার ভাণ্ডার কখনও শূন্য হয় না। পুত্রের রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া, অশ্রু-ধারা ঢালিয়া গৃহিণী যখন পুত্রের চিকিৎসার কোনও উপায়ই দেখিতে পান নাই, তখন নিরুপায়ের উপায় আপনি দ্বারের কাছে উপায় আনিয়া দিয়াছিলেন। ক্যাম্বিসের ব্যাগটি দক্ষিণ হস্তে ঝুলাইয়া স্বয়ং বিদ্যারত্ন মহাশয়, গৃহিণীর দুশ্চিন্তার অন্ধকার আকাশে প্রভাতকালীন শুকতারার ন্যায়, গৃহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহিণী আপন পরিধেয় বস্ত্র সংযত করিয়া, তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারের পার্শ্বে ব্যাগটি রাখিয়া কহিলেন,

"ওলার অসুখের কথা আমি গ্রামে ঢুকেই শুনেছি। এখন কেমন আছে ?"

গৃহিণী স্বামীকে গললগ্নীকৃতাঞ্চলে প্রণাম করিয়া গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন, "আর আমার ভাবনা নেই। এইবার তুমি এসেছ ; এইবার ওলা আমার ভাল হয়ে উঠবে। তুমি ওর কাছে গিয়ে বস ; আর মাথায় তোমার পায়ের ধূলা একটু দাও। আমি তত-ক্ষণ নেয়ে এসে তোমার জন্যে চারটি ভাত চড়িয়ে দি।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কন্যার বিবাহের জন্য প্রার্থনা করিয়া শিষ্য-গণের নিকট ঈপ্সিত পাঁচ শত টাকা প্রাপ্ত হন নাই ; কিন্তু কিঞ্চিদধিক দেড়শত টাকা পাইয়াছিলেন। ঐ টাকা ব্যয় করিয়া, জেলা হইতে দুইবার ডাক্তার আনাইয়া ওলার চিকিৎসা হইল। ওলা আরোগ্যলাভ করিল, পথ্য পাইল ; আবার পিতামাতার নয়নানন্দবর্দ্ধন করিয়া গৃহমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইল।

সুমুখীর বিবাহের জন্য বিদ্যারত্ন মহাশয় ও তাঁহার গৃহিণী আবার চিন্তিত হইলেন। চিন্তিত হইবারই কথা। কন্যা বিবাহের যোগ্যা হইয়াছিল ; তাহার বিবাহ দেওয়া পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহার উপর বয়স্থা কন্যাকে পাত্রস্থ না করায় গ্রাম মধ্যে তাঁহাদের নিন্দা হইয়াছিল ; সে নিন্দা তাঁহারা স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। মহেশপুর-নিবাসী রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পাশ করা পুত্রের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হইতেছে, একথা বাঁশফুলি গ্রামের সকল লোকেই শুনিয়াছিল। তাহারা একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিল যে তেমন পাত্র জগৎ ব্রহ্মাণ্ড অনুসন্ধান

করিলেও কোথাও পাওয়া যাইবে না; বিদ্যারত্ন নিতান্ত নির্বোধ তাই এমন সুপাত্র, এমন অল্পব্যয়ে মুষ্টিমধ্যে পাইয়াও ইতস্ততঃ করিয়া কাল বিলম্ব করিতেছেন। গ্রামবাসিগণ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অর্থাভাবের কথা বুঝিল না; তাহারা পরস্পরের নিকট কহিল যে বিদ্যারত্ন নিতান্ত ব্যয়কুণ্ঠ; তাঁহার হাতে যথেষ্ট অর্থ আছে; না থাকিলে সামান্য একটা পুত্রের চিকিৎসার জন্য জেলা হইতে ডাক্তার আনাইয়া কেহ এত টাকা ব্যয় করিতে পারে না। এখনও তাঁহার দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ হস্তে এত অর্থ আছে যে তাহাতে তিনি অনায়াসে পাঁচটা কন্যার বিবাহ দিতে পারেন; অথচ তিনি এমনই কার্পণ্যভাবাপন্ন যে সামান্য হাজার টাকা খরচ করিয়া একটা মেয়ের বিবাহ দিবেন না, চতুর্দ্দশ পুরুষের উজ্জ্বল মুখ মসীলিপ্ত করিয়া, যুবতী কন্যাকে গৃহে পূরিয়া রাখিবেন! গ্রাম্য ললনাগণও সুমুখীর সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসিত কটাক্ষপাত করিতে ত্রুটি করিলেন না।

লোকের মুখে মুখে ক্রমে সকল কথাই বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কর্ণে প্রবেশ করিল। লোকনিন্দার সুতীক্ষ্ণ বাণগুলা তাঁহার হৃৎপিণ্ড ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি তাহা নীরবে সহ্য করিলেন। অসহ্য ক্ষোভের মধ্যে এক-একবার আশান্বিত হইয়া ভাবিলেন, আহা! দেশে কি এমন সদাশয় ব্যক্তি কেহ নাই, যিনি তাঁহাকে আজ এক হাজার টাকা দান করিয়া এই অসহ্য কন্যাদায় হইতে উদ্ধার করেন!

১৫ই বৈশাখ রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে পত্র আসিল।

গৃহিণী বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি লিখেছেন?"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন, "লিখেছেন, যে দু' একদিনের মধ্যে আমার কাছ থেকে একটা পাকা কথা না পেলে, তিনি অন্যত্র পুত্রের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করবেন।"

গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি উত্তর দেবে? মেয়ের বিয়ে দেবার জন্যে ত আর একটা টাকাও নেই।"

বিদ্যারত্ন মহাশয় কহিলেন, "আজ ভেবে দেখি, কাল যা হয় একটা উত্তর দেওয়া যাবে। এখন ত সেখানে সুমুখীর বিয়ে হবার কোন উপায়ই দেখতে পাচ্ছিনে! আবার একটা বিশেষ ভাবনার বিষয় এই হয়েছে যে, মেয়ের বিয়ে দেব বলে' শিষ্যদের কাছ থেকে যে টাকা নিয়ে এসেছি, যদি এখন বিয়ে দেওয়া না ঘটে, তাহলে সে টাকাটা এখন তাদের ফেরত দেওয়া দরকার। কিন্তু ফেরত দেবার টাকা কোথায় পাব? আমাদের এই দু'খানা চালা আর বাস্তুজমী টুকু বন্ধক রেখে কি কেউ দেড়শো টাকা ধার দেবে? আজ রাতটা ভাবি, কাল সকালে যা হোক একটা কিছু করা যাবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

দুই হাজার টাকা।

সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঘন হইয়া আসিতেছিল। বিদ্যারত্ন মহাশয় সন্ধ্যা আহ্নিক শেষ করিয়া, শয়ন গৃহের দাবায় সন্ধ্যার অস্পষ্টালোকে নীরবে বসিয়া ছিলেন। ভাবিতেছিলেন, দৈব কি এমন সুপ্রসন্ন হইবেন যে, তিনি হাজার টাকা লাভ করিয়া, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারিবেন? দৈবের প্রসন্নতা লাভ করা ব্যতীত কন্যার বিবাহ দিবার আর ত কোন উপায়ই ছিল না। অন্ধকার ক্রমে গাঢ় হইল দেখিয়া, কন্যা সুমুখী পিতার নিকট একটি দারুময় দীপাধারে একটি প্রজ্জ্বলিত মৃৎপ্রদীপ রাখিয়া গেল। কন্যার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ক্রমে রাত্রি এক প্রহর অতীত হইল। কড়ি ও ওলা রাত্রের আহার সমাপন করিয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। গৃহিণী বিদ্যারত্ন মহাশয়কে অন্ন দিবার জন্য স্থান মার্জ্জন করিয়া, কম্বলের আসনখানি বিছাইয়া দিলেন। কিন্তু অন্ন দেওয়া হইল না।

সহসা বহির্দ্বারে করাঘাত করিয়া কোনও ব্যক্তি ডাকিল—"বিদ্যারত্ন মশায়, বিদ্যারত্ন মশায় বাড়ী আছেন?"

রাত্রে অপরিচিত কণ্ঠস্বরে কে তাঁহাকে ডাকিল, ইহা ভাবিতে

ভাবিতে বিদ্যারত্ন মহাশয় দ্বারের নিকট আসিয়া অর্গল খুলিয়া দেখিলেন যে কোন অপরিচিত ভদ্র বক্তি দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া আছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে আপনি?"

ভদ্রব্যক্তি অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "বলছি, ভিতরে চলুন।"

বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কোনও বহির্ব্বাটী ছিল না। তিনি শয়ন গৃহের দাবায় একটি কম্বল বিস্তৃত করিয়া ভদ্রব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া তাহাতে বসাইলেন; এবং তাঁহার মুখের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনরপি প্রশ্ন করিলেন, "মশায়ের নাম? কি অভিপ্রায় আসা হয়েছে?"

ভদ্রব্যক্তি উপবেশন করিয়া কহিলেন, "আমাকে আপনি চিন্‌তে পারছেন না?'

বিদ্যারত্ন মহাশয় প্রদীপটি আরও উজ্জ্বল করিয়া দিয়া, ভদ্রলোকটিকে উত্তমরূপে দেখিয়া বলিলেন, "বিলক্ষণ! আপনাকে আর চিন্‌ব না? আপনার হাত থেকে কতবার পণ্ডিত বিদায় গ্রহণ করেছি। আপনি মহেশপুরের জমীদার রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের খাতাঞ্চী।"

খাতাঞ্চী বাবু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন, কেহ কোথাও আছে কি না; তাহার পর কহিলেন, "হ্যাঁ, আমি রায় বাহাদুরের কাছ থেকেই আসছি। একটু বিশেষ প্রয়োজনেই তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

বিদ্যারত্ন। এই রাত্রে? রাত্রে কি প্রয়োজন?

খাতাঞ্চী। দিনে আপনার কাছে আসিনি, কারণ আমাদের

উদ্দেশ্য নয় যে আমি এসেছিলাম তা গ্রামের কোনও লোক জান্‌তে পারে।

বিদ্যারত্ন। এই গোপনীয় প্রয়োজনটা কি ?

খাতাঞ্চী। প্রয়োজনটা কি আপনাকে বলি শুনুন ; আপনার বোধ হয় মনে আছে যে, প্রায় একমাস আগে আপনি একবার মহেশপুরে গিয়েছিলেন ?

বিদ্যারত্ন। বিলক্ষণ মনে আছে। রঘুনাথ মুখুয্যের বাড়ীতে মেয়ের জন্যে পাত্র দেখতে গিয়েছিলাম।

খাতাঞ্চী। সেদিন পাত্র দেখে বাড়ী ফেরবার পথে মহেশপুরে আর কিছু দেখেছিলেন ?

বিদ্যারত্ন। দেখেছিলাম। জমীদার রায় বাহাদুরের হুকুমে তাঁর পাইকেরা একজন ভদ্র মুসলমান প্রজাকে প্রহার করছিল ; দেখে, আমি তা নিবারণ করেছিলাম ; আর মুসলমানকে তার বাড়ীতে পৌছিয়ে দিয়েছিলাম।

খাতাঞ্চী। সেই বজ্জাৎ বিধর্ম্মী মোসলমানটার নাম মহম্মদ আলি। সে প্রজা হয়ে জমীদার রায় বাহাদুরের নামে নালিশ করেছে। আস্পর্দ্ধাটা একবার দেখুন ! সে আপনাকে সাক্ষী মেনেচে ;—ব্যাপারটা আপনি ছাড়া বাইরের লোক আর ত কেউ দেখে নি। তাই রায় বাহাদুর আমাকে অপনার কাছে পাঠিয়েছেন। বলেছেন যে আপনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ; ব্রাহ্মণ ছাড়া, তাঁর মত ব্রাহ্মণ জমিদারকে কে রক্ষা করবে ? আপনি হিন্দু, মোসলমানের পক্ষ অবলম্বন করে' হিন্দু ও গো ব্রাহ্মণের রক্ষাকর্ত্তা জমীদারকে

যদি রক্ষা না করেন, তাহলে পৃথিবীতে আর হিন্দুয়ানী থাকবে না। তিনি আপনার সম্মান রাখতে ক্রটি করেন নি। তিনি শুনেছেন যে কন্যার বিবাহে রঘুনাথ বাবুকে আপনার টাকা দিতে হবে, তার জন্যে আপনার প্রণামী দেড় হাজার টাকা আমার হাতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, মোকর্দ্দমায় জিত হলে, এ ছাড়া পাঁচশো টাকা প্রণামী দেবেন। টাকাটা—"

এই বলিয়া, খাতাঞ্চী বাবু পকেট হইতে নোটের তাড়া বাহির করিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সম্মুখে রাখিলেন।

বিদ্যারত্নমহাশয় তাহা স্পর্শ না করিয়া কহিলেন, "আমি এখন পর্য্যন্ত সাক্ষীর সমন পাইনি; যদি পাই তা হলে আমাকে কি করতে হবে?"

খতাঞ্চীবাবু অকুণ্ঠ্য কণ্ঠে কহিলেন, "তার পক্ষের সাক্ষী হয়ে, আদালতে গিয়ে বলতে হবে যে, আপনি এক বছরের ভেতর মহেশপুরে একবারও যাননি, আর কখনও কোনও মারপিটও দেখেন নি। বেটা মোসলমান তখন বুঝবে যে হিন্দুর বিপক্ষে হিন্দু কখনও সাক্ষ্য দেয় না।"

খাতাঞ্চীবাবুর অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া লজ্জায় ও অপমানে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের চক্ষুকর্ণ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। সহসা বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। অবনত আননে ভাবিলেন, সত্যের বিনিময়ে এই অর্থটা গ্রহণ করলে মনোমত সুপাত্রের সহিত সুমুখীর বিবাহ সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হইয়া যাইবে, তাঁহার ভদ্রাসন ঋণদায় হইতে রক্ষা পাইবে, তাঁহার প্রিয়তমা পত্নীর অঙ্গের অলঙ্কার সেই

সুন্দর অঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া দেহশোভা বর্দ্ধিত করিবে। হায় ভগবান্! তুমি দরিদ্র কন্যাদায়গ্রস্ত ব্রাহ্মণকে একি মহা পরীক্ষায় নিক্ষেপ করিলে! ব্রাহ্মণ কি সত্যের অবমাননা করিয়া আপন মহাকুলকে কলঙ্কিত করিবেন? তিনি কি এই হেয় অর্থের সহিত এই মহা অপমান মস্তকে তুলিয়া লইবেন? না।

বিদ্যারত্ন মহাশয় কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইলেন। তারপর দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "মহাশয়, রায় বাহাদুরকে বল্‌বেন যে তাঁর এই অর্থ আমি কখনই গ্রহণ করতে পারব না। আপনি নোটগুলি নিয়ে, আর বৃথা বাক্যব্যয় না ক'রে আমার কুটীর এই দণ্ডে ত্যাগ করুন।"

খাতাঞ্চীবাবু কিয়ৎকাল বিদ্যারত্ন মহাশয়ের দিকে বিস্ময়বিকৃত নয়নে চাহিয়া রহিলেন; এবং তাঁহার সুদৃঢ় মুখভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন যে, এই ব্রাহ্মণের সহিত আর যুক্তিতর্ক করা বৃথা হইবে। তিনি নোটগুলি তুলিয়া লইয়া গাত্রোত্থান করিলেন; এবং প্রস্থানোদ্যত হইয়া কহিলেন, "আপনি অত বড় একটা জমিদারের বিপক্ষতাচরণ ক'রে সুবিবেচনার কায করলেন না। জানবেন, তাঁর ক্রোধে আপনার মহা অনিষ্ট ঘটবে।

বিদ্যারত্ন মহাশয় উদ্বেগশূন্য কণ্ঠে কহিলেন, "খাতাঞ্চীবাবু, আপনি বৃথা ভয় প্রদর্শন করছেন। মানুষের ক্রোধকে আমি কখনও ভয় করিনি, এখনও করবো না,—সে মানুষটা জমীদারই হোক, আর রাজাই হোক।"

ভদ্রব্যক্তি প্রস্থান করিলে বিদ্যারত্ন মহাশয় আহার করিতে

বসিয়া মুগ্ধনেত্রা গৃহিণীর নিকট ঘটনাটা বিবৃত করিয়া কহিলেন, "দেখ গিন্নি, এখন সুমুখীর বিয়ের ভারটা, আমি আর নিজের হাতে রথ্‌লাম না ; তা ভগবানের হাতে সমর্পণ করলাম। এখন নিজেকে কন্যাদায়গ্রস্ত মনে করে অর্থলাভের প্রলোভনে পড়তে হবে না। মেয়ের বিয়ে দেব বলে, শিষ্যদের কাছথেকে যে টাকা এনেছি, কালই ভদ্রাসন বন্ধক রেখে, তা পরিশোধ করবার ব্যবস্থা করবো। তোমার অলঙ্কার গেল, আমার ভদ্রাসন গেল ; কিন্তু, গিন্নি, আমাদের হাতে ধর্ম্মের অবমাননা হয় নি।"

গৃহিণী কথা কহিলেন না। সত্যালোকে সমুজ্জ্বল, স্বামীর সেই প্রশস্ত ললাটের দিকে তাকাইয়া আপন মনে ভাবিলেন—'ধন্য আমি।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুমুখীর বিবাহ।

বাঁশফুলি গ্রামের দুইজন ভদ্রলোক আদালতে সাক্ষ্য দিয়া কহিল যে, ঐ অবাস্তব ঘটনার দিন বিদ্যারত্ন মহাশয় মোটেই মহেশপুরে যান নাই ; সেদিন সমস্ত সকাল বেলাটা তিনি প্রকৃত-পক্ষে বাঁশফুলি গ্রামেই ছিলেন, এবং বারোয়ারীর চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া তাহাদের সহিত গল্প করিয়াছিলেন। মহেশপুরের রঘুনাথ মুখো-পাধ্যায় হলফ করিয়া বলিলেন যে, বিদ্যারত্ন মহাশয় কস্মিনকালে

তাঁহার কন্যার বিবহের প্রস্তাব লইয়া তাঁহার বাটীতে আসেন নাই। জেলার হাঁস্‌পাতালের যে ডাক্তার মহম্মদ আলির মুখমণ্ডলের আঘাত চিহ্ন সকল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তিনিও শপথ গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, কোন উচ্চ স্থান হইতে নিম্নমুখে পতিত হওয়ায়, সম্ভবতঃ ঐ সকল ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছিল। মহম্মদ আলির দুইজন মুসলমান প্রতিবেশী ডাক্তার বাবুর কথার সমর্থন করিয়া কহিল যে, তাহারা মহম্মদ আলিকে এক গো শকট হইতে কঙ্করময় রাস্তায় নিম্নমুখে পতিত হইতে দেখিয়াছিল। কলিকাতা হইতে একজন এটর্ণি আসিয়া অম্লানমুখে বলিলেন যে, তথাকথিত ঐ ঘটনার দিন সকালে এবং তাহার পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার সময়, মহেশপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর কার্য্যোপলক্ষে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবং কলিকাতায় ছিলেন। জমিদার বাবুর এক সত্যবাদী কর্ম্মচারী কহিল যে, মহম্মদ আলি অন্যায় পূর্ব্বক বিনা খাজানায় যে অতিরিক্ত জমি দখল করিতেছিল, তাহার খাজনা চাওয়ায় সে মনের আক্রোশে অকারণ জমীদার বাবুর নামে এই মিথ্যা মকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে। মহেশপুরের একজন মুসলমান প্রজা কর্ম্মচারীর কথার সমর্থন করিল। সাক্ষীদের জবানবন্দী শুনিয়া, এবং আদালতের প্রধান উকিলের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া, বিচারক রায় লিখিলেন যে মোকর্দ্দমা সর্ব্বৈব মিথ্যা।

মহম্মদ আলি ম্লান মুখে বাড়ী ফিরিয়া গেল। যাইবার সময় শুনিয়া গেল যে, জমীদারের নামে মিথ্যা মকর্দ্দমা রুজু করার

জন্য ফৌজদারী আইন অনুযায়ী তাহার দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হইবে।

জমীদার রায় বাহাদুর মাথায় জয়পত্র বাঁধিয়া মহেশপুরে ফিরিয়া আসিলেন। গ্রামে আসিয়া তিনি তাঁহার দেওয়ানজীকে কহিলেন, "মিথ্যা মকর্দ্দমা আনার জন্যে যাতে মহম্মদ আলির জেল হয় তার ব্যবস্থা আমি করে এসেছি। এই অবসরে তার সমস্ত ধানী জমীগুলো, একে একে তার হাত থেকে কৌশলে কেড়ে নিতে হবে। বেটা জানে না যে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে জলে বাস করা চলে না।"

দেওয়ানজী 'যে আজ্ঞে' বলিয়া কৌশল অবলম্বনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রায় বাহাদুর, রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডাকিয়া সৎপরামর্শ দিলেন যে তাঁহার পুত্রের বিবাহের জন্য বহু-অলঙ্কার-ধারিণী প্রভূত যৌতুক আমদানীকারিণী মনোমোহিনী কন্যা আনিয়া দিবেন; তিনি যেন বাঁশ-ফুলি বিদ্যারত্নের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ না দেন।

রঘুনাথ বাবু ধীরে ধীরে কহিলেন, "আজ্ঞে, বিদ্যারত্ন মশাই এই মকর্দ্দমার অনেক দিন আগেই পত্র লিখে জানিয়েছেন যে, আমার ছেলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেওয়া তাঁর সাধ্যাতীত।'

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?"

রঘুনাথ বাবু কহিলেন, "আমি যে হাজার টাকা চেয়েছিলাম, তা তিনি সংগ্রহ করতে পারেন নি।"

রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন, যে হাজার টাকা সংগ্রহ করে' যে একটা মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, সেই কন্যাভারগ্রস্ত অন্নহীন দরিদ্রের এত গর্ব্ব? এ গর্ব্ব আমি চূর্ণ করবো। আর কোথাও যাতে তার মেয়ের বিয়ে না হয়, জনসমাজে যাতে তার মুখ হেঁট হয়, তার ব্যবস্থা আমি করবো।

রায় বাহাদুর আপন অভিপ্রায় মত ব্যবস্থা করিলেন। এক দিকে অর্থাভাবে, অন্য দিকে নানা অপবাদে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কন্যার বিবাহ রহিত হইয়া গেল। তথাপি রায় বাহাদুর মনে শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের উন্নত দেহ সত্যের বিজয় স্তম্ভের ন্যায় তাঁহার অশান্ত মনোমধ্যে নিশিদিন চিত্রিত হইয়া রহিল। সেই চিত্রের পদতলে মিথ্যাভারে যেন তাঁহার মস্তক বারবার অবনত হইয়া পড়িত। কি অশান্তি! তাঁহার শত চেষ্টা সত্ত্বেও, বিদ্যারত্ন উন্নত সত্যবাদী রহিলেন, আর তিনি নিজে পতিত মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছু হইতে পারিলেন না। কি অশান্তি! তাঁহার শত নিন্দাতেও বিদ্যারত্ন মহাশয়ের কন্যার অনিন্দ্য পবিত্রতায় একটুও কলঙ্কপাত হইল না; কেবল তিনিই হেয় নিন্দুক হইলেন। অশান্তির তরঙ্গাঘাতে তাঁহার হৃদয় বিলোড়িত হইতে লাগিল। তাঁহার অশান্তির সমুদ্রে, সমুদ্রমধ্যবর্ত্তী আলোকস্তম্ভের ন্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সত্যের জ্যোতি জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে মনের অশান্তিতে রায় বাহাদুরের দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। তাঁহার রাত্রিগুলি অনিদ্রায় কাটিতে লাগিল। বিনিদ্র

থাকিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া তিনি বারবার ভাবিতেন, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের অপরাধটা কি? দুই সহস্র মুদ্রা প্রাপ্তির প্রলোভনেও, দরিদ্র কন্যাভারগ্রস্ত ব্রাহ্মণ মিথ্যা বলেন নাই, ইহাই কি তাঁহার অপরাধ? এই অপরাধের জন্যই কি তিনি তাঁহাকে অশেষ বিধানে লাঞ্ছিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন? আর পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিসমা গৃহস্থকন্যা! সে তাঁহার কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল যে তিনি তাহার জীবনটা বৃথা করিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন? ভাবিতে ভাবিতে, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের ও তাঁহার কন্যার কাল্পনিক মূর্ত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিত। তাঁহাদের জ্যোতিতে তাঁহার হৃদয়ের পুঞ্জীকৃত পাপ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিত। মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় তাঁহার মর্ম্মস্থল ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইত।

জমীদার-গৃহিণী স্বামীর এই অশান্তি ও অনিদ্রা লক্ষ্য করিলেন। দেখিলেন, স্বামীর সুন্দর মুখমণ্ডলে মনকষ্টের একটা কৃষ্ণ ছায়া পতিত হইয়াছে। তিনি স্বামীর মুখের দিকে বিষাদপূর্ণ নয়নে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি হয়েছে?"

রায় বাহাদুর গৃহিণীর নিকট তাঁহার মনের অশান্তির কথা ও তাহার কারণ অকপটে বিবৃত করিলেন।

জমীদার গৃহিণী কহিলেন, "এর প্রতীকার ত তোমারই হাতেই রয়েছে। যা করে মনে শান্তি পাচ্ছ না, তা আর করো না।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিন্তু যা করে ফেলেছি, আর তার যা বিষময় ফল ফলেছে, তা কি করে নষ্ট করবো?"

জমীদার গৃহিণী কহিলেন, "তুমি রাগ কোরো না; তোমাকে একটা কথা বলবো। জেনো, তোমার কাষে কোনও অনিষ্টই হয় নি। তোমার সমস্ত বিদ্বেষের এতটুকুও বিদ্যারত্ন মশায়ের কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারে নি। তিনি দরিদ্র হলেও, মনে শান্তি উপভোগ করে প্রফুল্ল মনে আপন কুটীরে বাস করছেন। জেনো এই ভগবানের পৃথিবীতে মিথ্যার কখনও জয় হয় না; তাঁর পৃথিবীতে চিরকাল সত্যেরই জয় হয়ে এসেছে।"

রায় বাহাদুর কহিলেন, "এখন তা আমি খুব বুঝেছি। খুব বুঝেছি, যে বিদ্যারত্ন মশায়কে জব্দ করতে গিয়ে, আমি নিজে জব্দ হয়েছি, তিনি হন নি। তাঁর কোনও অনিষ্ট হয় নি, কাযেই তার কোন প্রতিকারের দরকার নেই। কিন্তু আমার মিথ্যা নিন্দায় তাঁর নিরপরাধা কন্যার যে অনিষ্ট হয়েছে, তার ত একটা প্রতীকার করতে হবে?"

জমীদার গৃহিণী কহিলেন, "তার প্রতীকারও তোমারই হাতে রয়েছে। তুমি নিজে সেই মেয়ের বিয়ে দাও।"

রায় বাহাদুর কহিলেন, "আমি তার সম্বন্ধে যে মিথ্যা নিন্দা রটনা করেছি, লোকে তা সত্য বলে জেনেছে; এখন কে তাকে বিয়ে করবে?"

জমীদার গৃহিণী কহিলেন, "লোকে সত্য বলে জানুক্, তুমি ত জান যে সে নিন্দাটা ভয়ানক মিথ্যা। অন্য কারও সঙ্গে তার বিয়ে দিতে পারবে না বটে, কিন্তু তোমার ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে তোমার কোনও আপত্তি থাক্‌তে পারে না। তুমি ছেলের

জন্যে সুপাত্রী খুঁজে বেড়াচ্চ ; এমন সুপাত্রী, এমন বাপের মেয়ে তুমি কোথায় পাবে ? আর মেয়েটিও খুব সুরূপা ; আমি বাঁশফুলের অনেক মেয়েমানুষের মুখে এই মেয়ের রূপের সুখ্যাতি শুনেছি। তুমি এই মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দাও। তা হলেই আবার মনের শান্তি ফিরে পাবে।"

রায় বাহাদুর কিয়ৎকাল চিন্তা করিলেন ; তাহার পর কহিলেন, "তুমি ঠিক বলেছ গিন্নি, আমি এই মেয়ের সঙ্গেই হেমের বিয়ে দেব। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের এই মেয়ে হেম বিয়ে করে' আমার কুলে সত্যের প্রতিষ্ঠা করবে।"

হেমচন্দ্র, রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র। সে এম্-এ পাশ করিয়া কলিকাতায় থাকিয়া আইন পড়িতেছিল। সে পিতার পত্র পাইয়া বাটী আসিল। বিবাহের জন্য মাঘ মাসের একটা শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। সুমুখীর বর মিলিল। যে বরের সহিত বিধাতা তাহার বিবাহ নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহারই সহিত শুভ-দিনে মহাসমারোহে সুমুখীর বিবাহ হইয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে, আদালতের বিচারে কথন-কথনও মিথ্যার জয় হইলেও, ভগ-বানের বিচার চিরদিন সত্যেরই জয় হয়।

বারুণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

নবীন দম্পতীর চক্রান্ত।

সে দশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সুশীলা তখন ষোড়শী। সুশীলার স্বামী পুণ্ডরীকাক্ষ তখন নবীন যুবা;—তখনও তাহার স্ফুটনোন্মুখ মুখ পুণ্ডরীকের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া, শ্মশ্রুভ্রমর-সকল সম্যক্ সমাগত হয় নাই। যুবক যুবতী তখন পুষ্পধন্বার শরাসন হইতে প্রক্ষিপ্ত আকুল পুষ্পসমাকীর্ণ এক স্বপ্নময় প্রেম-রাজ্য রচনা করিয়া অতি সুখে সুখের দিনগুলি অতিবাহিত করিত। পুণ্ডরীকের মাতাপিতা বর্ত্তমান ছিলেন; তৈল-তণ্ডুল-বস্ত্রেন্ধন-চিন্তা পুণ্ডরীকের অবিছিন্ন প্রেমস্বপ্নকে তখন কোনক্রমে ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইত না। যুবক যুবতীর কোনও দুঃখ ছিল না বটে, কিন্তু পুণ্ডরীকের মায়ের মনে একটা ক্ষোভ ছিল; কুলদেবতাদিগের পাদপদ্মে তাহার বহু বিনীত প্রার্থনাতেও সুশীলা পুত্রবতী হইতে পারে নাই; তাহার অবাধ স্বামিপ্রেম একটি নবাগত অবোধের ক্রন্দনের দ্বারা অনুশাসিত হয় নাই।

বি-এ, পরীক্ষার পর শ্রীমান্ পুণ্ডরীকাক্ষ রায় কলিকাতা হইতে তাহাদিগের পল্লীগ্রামের বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়াছিল।

সম্মুখে সুদীর্ঘ অবকাশ। এই সুদীর্ঘ অবকাশ, কেবলমাত্র প্রণয়িনীর বিরহব্যথায় প্রেমানুলেপনে অতিবাহিত করা সহজ নহে। প্রেমতন্দ্রাবিজড়িত সুদীর্ঘ দিনগুলি, অতি সন্তর্পণে, অতি মন্থরগমনে অতিবাহিত হইতেছিল। পুণ্ডরীকের নবীন প্রাণ এ জড়তা হইতে মুক্তিলাভের জন্য কাতর হইয়া পড়িল। সে একটা নূতন উদ্দীপনাপূর্ণ আনন্দের অন্বেষণ করিল।

অর্গলবদ্ধ গৃহে, পত্নী-প্রেমের মধুরতা পুণ্ডরীক আকণ্ঠ পান করিয়াছিল; কিন্তু বাহিরে,—উদার অনন্ত আকাশের নিম্নে সঙ্কোচশূন্য পত্নীপ্রেমের মধুরতা যে কত মধুর, তাহা আস্বাদন করিবার অবসর এ পর্য্যন্ত পুণ্ডরীকের ভাগ্যে ঘটে নাই। ইতিপূর্ব্বে সে কতবার মনে করিয়াছিল যে, পত্নীকে সঙ্গে লইয়া কোন দূর দেশে পরিভ্রমণ করিবে। কিন্তু বালক কখনই পিতামাতার নিকট এরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। এবার তাহার চিরদিনের আকাঙ্ক্ষাটি অত্যন্ত সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার বার বার মনে হইতে লাগিল যে কোনও দূর দেশে পত্নীকে লইয়া পরিভ্রমণ করিলে, তাহাকে পার্শ্বে রাখিয়া ধরণীর মুক্ত শ্রী অবলোকন করিলে, বুঝি বা প্রকৃতির রুচির ছবি আরও কত মধুর হইয়া উঠিবে!

এক দিন নিশাশেষে, সুশীলার সম্প্রসারিত বাহুর মধ্যে স্থানলাভ করিয়া, পুণ্ডরীক অতি প্রেম-গদগদ-কণ্ঠে ডাকিল, "সুশীলা!"

সুশীলা কহিল, "কেন?"

পুণ্ডরীক। এক জায়গায় যাবে?

সুশীলা। কোথায়? তুমি কতবার বলেছ আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবে। কিন্তু তুমি ত কখন কোন জায়গায় যাও না। আমাকে ভোলাবার জন্যে তুমি কেবল মিথ্যে কথা বল।

পুণ্ডরীক। এবার সত্যিই যাব।

সুশীলা। বল, কোথায় যাবে?

পুণ্ডরীক। গঙ্গাসাগরে। এবার প্রতিজ্ঞা করেছি, বারুণী স্নানের দিন তোমাকে গঙ্গাসাগরে স্নান করাব। তুমি গঙ্গা-সাগর স্নানের মন্ত্র জান?

সুশীলা। তা'ত জানি নে। কি মন্ত্র? তুমি জান? আমাকে শিখিয়ে দিও।

সুশীলা তাহার অতিপ্রিয় প্রিয়তমের সহিত সাগরে যাইবে। ষ্টীমার চড়িবে। ষ্টীমারে চড়িয়া কত দেশ বিদেশ দেখিবে। সাগর স্নান করিয়া কত কোটিকল্প পুণ্য সঞ্চয় করিবে, কত কোটিকুল উদ্ধার করিবে। তাহার আনন্দের আর সীমা নাই। উৎসাহ বেগে স্বামীর আলিঙ্গনমুক্তা হইয়া সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল। আপন কুসুমসন্নিভ রক্ত করতল স্বামীর বক্ষে স্থাপন করিয়া, আগ্রহভরে কহিল, "বল, কি মন্ত্র?" আমি এখনই শিখবো।"

পুণ্ডরীক। না, না; আমি মন্ত্র জানি নে। তুমি উঠো না; এখনও সকাল হয় নি।

সুশীলা। না, তুমি জান। তুমি আগে বল, আমাকে শিখিয়ে দেবে?

পুণ্ডরীক। আচ্ছা, সে মন্ত্র আমি তোমাকে এর পর লিখে দেব, তুমি মুখস্থ করে নিও।

সাগরস্নানের মন্ত্র যে সে শিক্ষা করিতে পারিবে, তদ্বিষয়ে সুশীলা নিশ্চিন্ত হইতে পারিল বটে, কিন্তু তাহার মনে আবার একটা দুশ্চিন্তা প্রবেশলাভ করিল। সে মন্ত্র শিক্ষা করিবে, কিন্তু যদি তাহাদের সাগরে—কি জানি, যদি দৈবাধীন তাহাদের সাগরে মোটেই যাওয়া না হয়? সে সংশয়-প্রকম্পিতচিত্তে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা যদি কোনও কারণে আমাদের যাওয়া না হয়?"

পুণ্ডরীক। কেন হবে না?

সুশীলা। আমি যদির কথা বলছি। যদি না যাওয়া হয়?

পুণ্ডরীক। এর মধ্যে কিছু 'যদি' নেই, সকলই 'নিশ্চয়'।

সুশীলা। মা বাবা যদি আমাদের যেতে না দেন?

পুণ্ডরীক। কেন দেবেন না? যদি কেবলমাত্র আমরা যেতাম, তা হলে হয়ত তাঁরা বারণ করতেন। কিন্তু আমি মাকেও নিয়ে যাব।

সুশীলা। তুমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছ?

পুণ্ডরীক। এখনও করি নি। আজ ভাত খাবার সময় সমস্ত ঠিক করব। সে ভার আমার। শোন, আমি এক কৌশল করব। আমি মাকে বলব, 'চল, আসচে বারুণীতে তোমাকে

গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়ে আনি।' একে গঙ্গাস্নান, তাতে বারুণীতে বিদেশে, গঙ্গাসাগরে গঙ্গাস্নান,—মেয়ে-মানুষ মা আমার, আমার এ প্রস্তাবে নিশ্চয় রাজি হবেন, আর বাবাকে বলে সাগর-যাত্রার সমস্ত উদ্যোগ করবেন। যখন সমস্ত ঠিক হবে, তখন তুমি মাকে ধরে বসবে, বলবে 'মা আমিও তোমার সঙ্গে সাগরে যাব। কিছুতেই ছাড়ব না।' বুঝলে? একটু বিশেষ জেদ করে বলতে হবে।

সুশীলা। তা, আমি খুব জেদ করে বলতে পারব।

পুণ্ডরীক। তখন আমিও বলব, 'তা মা একজন তোমার সঙ্গে থাকা ভাল; তোমার একলা কষ্ট হবে; এ ছাড়া বিদেশে কত বিপদ আপদ্ আছে।' তা শুনে মা নিশ্চয়ই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবার মত করবেন; আর মার মত হলেই বাবার অমত হবে না।

সুশীলা। না, বাবার অমত হ'বে না।

পুণ্ডরীক। তখন তোমার সহজেই যাওয়া হবে। তোমাকে নিয়ে সাগরে বেড়াতে যাব এ কথা মা বাবার কাছে বলতে আমার যে লজ্জা হত, এই কৌশলে সহজে তা থেকে রক্ষা পাব। তুমি কি বল?

সুশীলা আর কি বলিবে? সে মনে মনে তাহার স্বামীর সুগভীর বুদ্ধির অত্যন্ত প্রশংসা করিতেছিল। সহজে সাগরযাত্রা সমাধা করিবার জন্য নবীন দম্পতীর কি চূড়ান্ত চক্রান্ত! হায়! সংসারানভিজ্ঞ সরল তারা; তারা তখন বুঝিতে পারে নাই যে,

আমরা মানুষ, আমরা এই বিশ্বরঙ্গশালায় নিতান্ত শক্তিহীন পুতুলমাত্র। আমরা কিছু করি না; কিছু করিবার সামর্থ্যও আমাদের নাই। আমাদের সমস্ত চক্রান্তগুলি এক অদৃশ্য পুরুষের চিরঘূর্ণামান চক্রমাত্র। চিরদিন আমাদের চক্রান্তের ভিতর দিয়া তিনি আপনার দেবকার্য্য সিদ্ধ করিয়া লইতেছেন। চিরদিন আমরা ব্যর্থবুদ্ধি লইয়া, এই অদৃশ্যকে দৃশ্যমান্ দেখিবার জন্য অবাক্ নেত্রে চহিয়া রহিয়াছি। পুণ্ডরীক বুঝে নাই, সরলা সুশীলা বুঝে নাই যে, সেই দিন প্রভাতে তাহারা সাগরযাত্রার জন্য যে কৌশলের পথ অবলম্বন করিয়াছিল, দশ বৎসর পরে তাহা তাহাদিগকে কোন জ্বালাময় শ্মশানে লইয়া যাইবে। কি অশুভক্ষণে পুণ্ডরীক ও সুশীলা সাগর যাত্রার কল্পনা করিয়াছিল! এই 'সাগর' উত্থিত হলাহলে একদিন তাহাদের আনন্দপূর্ণ জীবনকে বিষময় করিয়া দিবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সাগরযাত্রা।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, সুশীলা যখন আপন শয়নগৃহের নিভৃতে বসিয়া, স্বামীর লিখিত এক ক্ষুদ্র কাগজ হস্তে লইয়া, অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে আবৃত্তি করিতেছিল;—

'ত্বং দেব সরিতাং নাথ
ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা
মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ ॥'—

তাহার সুবুদ্ধি স্বামীটি তখন মাতার সুগভীর স্নেহসাগরে আপন কৌশল-জাল বিস্তার করিতেছিল। বিবিধ ব্যঞ্জনপাত্রপরিবেষ্টিত অন্নপাত্র পুত্রের সম্মুখে রাখিয়া মাতা আহারে চিরপটু পুত্রকে এই ব্যঞ্জনটা বা ঐ অতিসামান্য মৎস্যমুণ্ডটুকু খাইবার জন্য অত্যন্ত উৎসাহ প্রদান করিতেছিলেন। অবসর বুঝিয়া পুণ্ডরীক জাল বিস্তার করিল; কহিল, "মা, তুমি কখনও ষ্টীমারে চড়েছ?"

মাতা। যে ষ্টীমার গঙ্গা দিয়া যায়, সেই ষ্টীমারের কথা বলছ?

পুণ্ডরীক। হাঁ,

মাতা। ষ্টীমারে লোকে কেমন করে চড়ে, পুণ্ডরীক?

পুণ্ডরীক। তুমি ত, মা কখনও ষ্টীমারে চড় নি? চড়বে? আমি নিয়ে যেতে পারি।

মাতা। কোথায় নিয়ে যাবে?

পুণ্ডরীক। তুমি যদি বল, তোমাকে আমি গঙ্গাসাগরে নিয়ে যেতে পারি।

মাতা। আমার কপালে কি বিধাতা এমন পুণ্যি লিখেছেন যে, তুমি আমাকে গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়ে আনবে?

পুণ্ডরীক। কেন আনব না? এই ১৪ই চৈত্র মঙ্গলবার

বারুণী। বারুণীর দিন তোমাকে গঙ্গাসাগরে স্নান করাব; দেখ মা, সে দিন পুরুত :মশায় বলছিলেন যে দশ কোটি কুল উদ্ধার হয়। আমি কিন্তু মা এ সকল কথা বিশ্বাস করিনে।

মাতা। তোমরা ইংরাজি পড়ে নাস্তিক হয়েছ। তোমরা কি আর ধর্ম্ম কর্ম্ম বিশ্বাস কর। তুমি দশ কোটি কুলের কথা কি বলছ, গঙ্গাসাগরের জল একবিন্দু মাথায় দিলে চৌদ্দ কোটি কুল উদ্ধার হয়। তা, তুমি যদি সত্যি আমাকে নিয়ে যেতে পার, তা হলে আমার জীবনের একটা সাধ পূর্ণ হয়।

পুণ্ডরীক। মা, আমি কি তেমনই মিথ্যাবাদী ছেলে? আমি সত্যি তোমাকে নিয়ে যাব, তুমি বাবাকে বলে সমস্ত উদ্যোগ কর। পরশু বেশ ভাল দিন আছে; আমরা পরশুই রওনা হব।

মাতা। কোথা দিয়ে যাবে?

পুণ্ডরীক। এখান থেকে ষ্টীমার চড়ে কলকাতায় যাব। কলকাতায় একদিন থেকে, অন্য বড় ষ্টীমারে চড়ে পরদিন সকালে সাগর রওনা হব। সাগরে সাত দিন থাকব; মেলা দেখব; তোমাকে "সাগরী" কিনে দেব। তারপর কলকাতায় ফিরে এসে দশ দিন থাকব। তোমাকে মদনমোহন, সিদ্ধেশ্বরী আর কালীঘাটের কালী সব দেখাব। চৈত্র-সংক্রান্তিতে নকুলেশ্বর শিবের মাথায় দুধ-গঙ্গাজল ঢেলো। কালীঘাটে ভাল ভাল পাথরের থালা-বাটী কিনতে পাওয়া যায়, কিনো। তার পর বৈশাখ মাসের প্রথমে আমরা বাড়ী ফিরে আসব।

মাতা। বেঁচে থাক। তোমার এক-শ আশী বছর পরমায়ু হোক। কর্ত্তার শরীর যে রকম খারাপ, তাতে যে কখনও তীর্থ-ধর্ম্ম করতে পারব, এমন আশা আমার ছিল না। কত পুণ্যের ফলে, তোমাকে বংশের তিলক পুত্র পেয়েছিলাম। আজ আমার মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলল।

বংশের তিলক, পুণ্যের ফল, পত্নীর নিকট আপন বিজয়-বারতা ঘোষণা করিবার জন্য, দ্রুত আহার সমাধা করিয়া ধাবিত হইল। মাতা গৃহকর্ত্তার অনুসন্ধানে ফিরিলেন। এবং সন্ধান লাভ করিয়া অনুনাসিক শব্দ যোজনার দ্বারা, পুত্র সহ সাগরযাত্রার অতি সহজ সম্মতি প্রাপ্ত হইলেন। তাহার পর পরিধেয় বস্ত্রসকল এবং আবশ্যক দ্রব্য সমূহ পেটক মধ্যে সংগৃহীত হইল। যে সকল দাস দাসী সঙ্গে যাইবে, তাহারাও প্রস্তুত হইল। প্রতিবেশিনী গৃহিণীসকল দলে দলে পুণ্ডরীকের মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিল। শতমুখে সুবর্ণের চন্দ্র পুণ্ডরীকের এক শত আশী বর্ষ জীবিত থাকিবার আদেশ প্রচারিত করিল।

যাত্রার দিন প্রভাত হইল। পুণ্ডরীকের মাতা বধূর চিবুক ধরিয়া কহিলেন, "লক্ষ্মী মা আমার; তুমি আমার ঘরের লক্ষ্মী। যদি, মা, গঙ্গাসারে মরে যাই, তুমি আমার মত ঘর সংসার করো, আর শ্বশুরের সেবা যত্ন করো। এই নাও, আমার চাবির থোকা তুমি রেখে দাও।"

সুশীলা চাবির থোলো গ্রহণ না করিয়া, শ্বশ্রূঠাকুরাণীর পদতল অশ্রুজলে সিক্ত করিয়া এবং তাহা সবলে করতলে গ্রহণ করিয়া

কহিল, "না মা, আমি কোন মতেই বাড়ীতে থাকিব না। আমিও তোমার সঙ্গে যাব ; একলা এখানে থাকতে পারব না।"

মাতা। তুমি মা ছেলে-মানুষ, তুমি বেঁচে থাক। আমার পুণ্ডরীক বেঁচে থাকুক, তুমি কতবার সাগরে যাবে।

সুশীলা। না মা, আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি বল যে নিয়ে যাবে, তা না হলে, আমি তোমার পা কিছুতেই ছাড়ব না।

বধূকে বিরত করিতে অক্ষমা হইয়া, মাতা পুণ্ডরীককে আহ্বান করিলেন। পুণ্ডরীক আসিয়া কহিল, "তা যদি ও একান্ত যেতে চায়, চলুক ; বিদেশে তোমার একলা অসুবিধা হতে পারে, একজন আপনার লোক কাছে থাকা ভাল।" শুনিয়া, গৃহিণী বাঁচিলেন। বস্ত্রাদি সত্বর গুছাইয়া লইবার জন্য বধূকে আজ্ঞা দিলেন। গৃহিণী ত জানিতেন না যে, বধূ যে কেবলমাত্র পূর্ব্ব হইতে আপনার বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিয়াছিল তাহা নহে, সে সাগরস্নানের মন্ত্রটি পর্য্যন্ত কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিল। অপিচ বারুণীস্নানের উপকরণ, সদ্য-আহৃত কাঁচা আম্র—আপন সজল জিহ্বাকে বঞ্চিত করিয়া পেটকমধ্যে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। কার্য্য উদ্ধার করিয়া পুণ্ডরীক আপন হাস্য-প্রফুল্ল দৃশ্যটি পত্নীর নির্ম্মল নয়নে নিক্ষেপ করিয়া, তাহাতেও হাস্যতরঙ্গ সৃষ্টি করিল।

বেলা দশটার পর, আহারাদি সমাপন করিয়া, ললাটতলে দধির মঙ্গল তিলক ধারণ করিয়া, কর্ণমূল দেবপূজার বিল্বদলে পরি-শোভিত করিয়া, পূর্ণকুম্ভের নিকট সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া, দাস-দাসী-পেটক পুটুলি-মাতা-পত্নী সমভিব্যাহারে শ্রীমান্ পুণ্ডরীকাক্ষ রায়

ষ্টীমারে চড়িয়া সাগরযাত্রা করিল। তাহার গৃহকোণবদ্ধ জড় জীবন, গঙ্গার অবাধ বিস্তৃত বক্ষে মুক্তিলাভ করিল। আরব্য-উপন্যাসের ক্ষুদ্র কুম্ভমুখনির্গত দৈত্যরাজের ন্যায়, তাহার বদ্ধ প্রেম ধূমাকারে অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুমীর নয়, পুঁটী।

সাগরে পৌঁছিয়া, বাসের সুবিধার জন্য, এবং সুবিধামত নানা স্থান পরিদর্শনের জন্য পুণ্ডরীক এক বজ্‌রা ভাড়া করিয়া লইল। বজ্‌রার কামরা হইতে সুশীলা এবং সুশীলার শ্বশ্রূঠাকুরাণী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কখন জনাকীর্ণ তীরভূমি, কখন বিপুল তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি অবলোকন করিতে লাগিলেন। যদিও পুণ্ডরীকের মাতা কখনও পর্ব্বত দেখেন নাই, তথাপি আমরা শুনিয়াছি যে, তিনি ঐ সকল জলতরঙ্গ নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাদিগের সহিত পর্ব্বতের তুলনা করিয়াছিলেন, এবং এইরূপ অভিমতও প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, উচ্চে উহারা এক একটি তালবৃক্ষের সমকক্ষ। মকর-সংক্রান্তিতে সাগরে যেরূপ মহা লোকসমারোহ হয়, বারুণী উপলক্ষে তদ্রূপ কিছুই হয় না; তথাপি সেবার বারুণীর সময় এত লোক সাগরের পুণ্যজলে স্নান করিয়াছিল যে, আমাদিগের এইরূপ বিশ্বাস,

পুরোহিত মহাশয়দিগের কথা যদি সত্য হয় যে, এক একটি ডুবে কোটি কোটি কোটী কুল নরক হইতে উদ্ধার লাভ করে, তাহা হইলে নিশ্চিতই সে বৎসর নরকটি একবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল। পুণ্ডরীকের মাতা, বধূ ও পুত্রকে লইয়া নানা স্থানে পদব্রজে ক্রমাগত বিচরণ করিয়া, এবং ঈপ্সিত কয়েকটি দ্রব্য স্বহস্তে ক্রয় করিয়া, একদিন সন্ধ্যার সময় ক্লান্ত হইয়া বজ্‌রাতে প্রত্যাগমন করিলেন। মাতা বজ্‌রার কামরার মধ্যে বসিয়া বধূর সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে নৈশ আহারের উদ্যোগ করিতেছিলেন। পুণ্ডরীক কামরার বাহিরে বসিয়া, বজ্‌রার পার্শ্ব হইতে নিম্নে হস্ত প্রসারিত করিয়া, অঙ্গুলিসকলের দ্বারা স্রোতোজলের সহিত ক্রীড়া করিতেছিল। দূরে—পশ্চিম গগনে আপন দিবা সময়ের রক্তাক্ত চিহ্ন রাখিয়া, এবং অবগাহন দ্বারা সাগরের জল রক্ত রঞ্জিত করিয়া সূর্য্যদেব বিশ্রামলাভের জন্য সন্ধ্যার কোলে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তরঙ্গসকল রাশি রাশি পূজার পুষ্প শিরে পরিয়া নৃত্য করিতেছিল; কখনও প্রগল্‌ভার ন্যায় খলখল শব্দে হাসিতেছিল। রাত্রি আপনার কৃষ্ণ অঞ্চলখানির দ্বারা ধীরে ধীরে পৃথিবীর গাত্র আচ্ছাদন করিতেছিল।

পুণ্ডরীক সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল। পুত্রের বেদনাবিজড়িত কণ্ঠস্বর শুনিয়া, মাতা ভীতা হইয়া কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন, পুণ্ডরীক স্রোতের জল হইতে আপন হস্ত সবলে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু তাহা জলের বাহিরে আনিতে সমর্থ হইতেছে না। কি সর্ব্বনাশ! মাতার প্রত্যেক অঙ্গ

প্রকম্পিত হইল। তিনি সভয়ে পুণ্ডরীককে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, তোমার হাত কি কোন জীবজন্তুতে কাম্ড়ে ধরেছে।"

পুণ্ডরীক কহিল, "হা, মা, বোধ হয় কুমীরে আমার হাত ধরে টানছে; তুমি মাঝিকে শীগ্‌গির ডাক।"

সুশীলা চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। চীৎকার করিয়া বলিল, "ওগো মাঝি! আমার সমস্ত গহনা আমি তোমাকে দেব, তুমি ওঁকে বাঁচাও।"

মাঝি কহিল, "কোন ভয় নেই; কোন ভয় নেই, মা ঠাকরুণ ও কুমীর নয়; আমি এখনই জলে নেমে দেখছি। বাবু, হাত টানাটানি কোরো না, তাতে শুধু হাতে বেদনা হবে।"

কথার সহিত, অন্যের নিষেধবাক্য শুনিবার পূর্ব্বেই, মাঝি জলে ঝম্প প্রদান করিল। এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে, পুণ্ডরীকের হস্তের সহিত কোন বস্ত্রাবৃত গুরুদ্রব্য নৌকার উপর উঠাইয়া দিল। এই গুরু দ্রব্যের দ্বারাই পুণ্ডরীকের হস্ত আবদ্ধ ছিল।

এ গুরুদ্রব্যটি কি? মাঝি তাহার উপর হইতে বসনাবরণ উন্মোচিত করিল। একটি মৃতকল্প ক্ষুদ্র বালিকা সবলে দুই হস্তের দ্বারা পুণ্ডরীকের মণিবন্ধ ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

বালিকা ভুবনমোহিনী রূপসী। তাহার কৃষ্ণ আলুলায়িত কেশগুচ্ছ ঐ নীল সাগরের তরঙ্গ অপেক্ষা সুন্দর। তাহার অঙ্গুলি-সকল, তরঙ্গের শিরঃশোভা পুষ্পদল অপেক্ষা কমনীয়। এইমাত্র অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের রশ্মি এবং সীমাহীন জলরাশি যে অপূর্ব্ব সন্ধ্যার সৃষ্টি করিয়াছিল, এই অপূর্ব্বা বালিকা সেই সন্ধ্যার অপেক্ষা

মধুর। পুণ্ডরীকের মাতা যে আলোকের সাহায্যে কন্যার মুখাবলোকন করিতেছিলেন, তাহার অলোকসামান্য লাবণ্য সেই আলোক অপেক্ষা উজ্জ্বল। তাহাকে পুণ্ডরীক দেখিল, পুণ্ডরীকের মাতা দেখিলেন এবং সুশীলা দেখিল। দেখিল যে যাহা পুণ্ডরীকের মণিবন্ধ সজোরে গ্রহণ করিয়া রহিয়াছে, তাহা কুম্ভীর নহে; জলনিমজ্জনে জ্ঞানাপহৃতা এক লাবণ্যময়ী কুমারী। কুমারীর বয়ঃক্রম পাঁচ ছয় বৎসরের অধিক হইবে না।

পুণ্ডরীকের প্রকোষ্ঠধৃত কুমারীর দুইটি কোমল হস্ত তাহা হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য চেষ্টা করা হইল; কিন্তু কেহই তাহাতে সহজে কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইল না।

মাঝি কহিল, "মা ঠাকৃরুণ, ওর জ্ঞান না হলে, হাত ছাড়িয়ে নিতে পারবেন না। প্রাণের ভয়ে খুব জোরে হাত ধরে, অজ্ঞান হয়ে গেছে। যতক্ষণ জ্ঞান না হবে, ততক্ষণ ও হাত কিছুতেই ছাড়বে না। আপনারা ওকে সজ্ঞান করবার চেষ্টা করুন।"

তাহাই করা হইল। বালিকাটি ধীরে ধীরে সংজ্ঞা লাভ করিল। পুণ্ডরীকের হাত ছাড়িয়া, চারি দিকে সভয়ে চাহিয়া দেখিল। তাহার পর ক্রন্দন করিল। ক্রন্দন করিয়া, অশ্রুজলে আপনার কোমল গণ্ড প্লাবিত করিয়া ফেলিল।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া, তাহার নিকট হইতে নিম্নলিখিত তথ্য কয়েকটি অবগত হইতে পারা গেল। লাভপুর নামক একটি পল্লিগ্রামে তাহাদের বাস; লাভপুর কোন্ জেলায়, তাহা সে জানে না। তাহার নাম পুঁটি। তাহারা কায়স্থ, তাহার পিতামাতা

নাই ; সে তাহার দিদিমার নিকট হরিপুরে থাকিত। গ্রামের কয়েকটি স্ত্রীলোকের সহিত তাহার দিদিমা বারুণী-স্নান-উপলক্ষে গঙ্গাসাগরে আসিয়াছিল ; সেও দিদিমার সহিত আসিয়াছিল। সেই দিন দ্বিপ্রহরে তাহার দিদিমা স্নান করিবার জন্য জলে নামিয়াছিল। সেও দিদিমার অঞ্চল ধরিয়া জলে নামিয়াছিল। পদস্খলিত হইয়া দিদিমা বেশী জলে যাইয়া পড়ে এবং ডুবিয়া যায়। দিদিমার অঞ্চল ধরিয়া টানাটানি করিতে করিতে সেও বেশী জলে ডুবিয়া যায়। তাহার পর তাহার আর কিছু স্মরণ নাই।

পুণ্ডরীক পুলিসে সংবাদ দিল ; নানা স্থানে অনুসন্ধান করিল, কোনক্রমে বালিকার কোনও আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইল না। পুঁটি তাহাদের বজ্‌রাতে থাকিয়া গেল। দুই দিন পরে যখন পুণ্ডরীক সকলকে লইয়া কলিকাতায় আসিল, পুঁটিও তখন তাহাদের সহিত আসিল।

পুণ্ডরীকের ইচ্ছা ছিল যে, কলিকাতায় কয়েকদিন অবস্থিতি করিয়া পুঁটির আত্মীয় স্বজন সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করে। তথায় উপস্থিত হইয়া, সে রেল্ ষ্টেসনে এবং ষ্টীমার ঘাটে যাহাকে সম্মুখে পাইল তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহই পুঁটীর দিদিমার তথ্য অবগত থাকিয়া, তাহারা সন্ধান দিতে সমর্থ হইল না। সে লাভপুর গ্রামের অনুসন্ধান করিল ; কেহ কেহ বলিল যে, বীরভূম জেলায় লাভপুর নামে এক পল্লীগ্রাম আছে। পুণ্ডরীক পুঁটীকে লইয়া নিজে সেই লাভপুরে গেল।

গ্রামে দেখিয়া পুঁটী হাত নাড়িয়া কহিল. "না, না এ আমাদের গাঁ নয়।"

পুণ্ডরীক কলিকাতায় ফিরিয়া আবার অনুসন্ধান আরম্ভ করিল। সংবাদপত্রসকলে বিজ্ঞাপন প্রচার করিল। কিন্তু সমস্তই বৃথা হইল; পুটীর দিদিমাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

অবশেষে পুণ্ডরীকের মাতা বলিলেন, "এ সোনার চাঁদ মেয়েটি আমাদের কাছেই থাকুক। স্বজাতি; আমার গর্ভের মেয়ে নেই, ওকে মেয়ের মত প্রতিপালন করব। এবং উপযুক্ত সময়ে বিয়ে দেব।"

কয়েকদিন কলিকাতায় থাকিয়া পুণ্ডরীক সকলকে লইয়া গৃহে ফিরিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পুঁটী বারুণী হইল।

গৃহে দুইটি অত্যন্ত শুভ সংবাদ তাহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র পুণ্ডরীকের পিতা পুণ্ডরীকের হস্তে দুইখানি তারের সংবাদ দিলেন। একখানি তারের সংবাদ কয়েক দিন পূর্ব্বে পাওয়া গিয়াছিল। গঙ্গার উপরের এক চর লইয়া, তাঁহাদের সহিত অন্য এক জমীদারের এক দীর্ঘকালব্যাপী এবং বহু অর্থ-ধ্বংসকারী মকদ্দমা হইতেছিল;

কলিকাতা হাইকোর্টে এই মকদ্দমার শেষ মীমাংসা হয়; শেষ মীমাংসায় পুণ্ডরীকের পিতার জয় লাভ হইয়াছিল; এই তারের সংবাদে ইহাই লিখিত ছিল।

দেখিয়া, পুণ্ডরীক পিতাকে কহিল, "বাবা, এই বার আমাদের বিষয়ের আয় বৎসরে প্রায় দু হাজার টাকা বেড়ে যাবে।"

পিতা বলিলেন, "হঁ্যা শুধু বাড়বে না, মকর্দ্দমার খরচা বাবদ অনেক নগদ টাকা পাওয়া যাবে। তুমি অন্য টেলিগ্রামটি পড়; ওটি আমি এইমাত্র তোমাদের গৃহপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছি।"

পুণ্ডরীক তাহা পাঠ করিয়া জানিল যে সে বি-এ পরীক্ষায় বিশেষ সুখ্যাতির সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছে।

পুণ্ডরীকের মাতার আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁহার সাগর স্নানের পুণ্যফল সদ্যই ফলিল। তিনি বাটী ফিরিয়াই স্বামীর ললাট মকদ্দমার অহরহ চিন্তা হইতে মুক্ত, এবং পুত্রকে পরীক্ষায় কৃতকার্য্য দেখিলেন। তিনি গণনা করিয়া দেখিলেন, যে দিন সন্ধ্যার পর মকদ্দমায় জয়লাভের সংবাদ আসিয়াছিল, সেইদিন ঠিক সেই সময় জলনিমজ্জিত পুঁটী পুণ্ডরীকের হস্তধারণ করিয়াছিল। আর, যে মুহূর্ত্তে তিনি পুঁটীকে লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেইক্ষণে পুণ্ডরীকের পরীক্ষা সম্বন্ধে শুভ সংবাদ অসিয়াছিল। অতএব পাড়ার পাঁচজন গৃহিণীর বিচারে স্থির হইয়া গেল যে পুঁটী সাক্ষাৎ লক্ষী, কারণ এমন সুন্দরী এবং এমন সুলক্ষণা কন্যা লক্ষ্মী ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না।

পুণ্ডরীককে আহ্বান করিয়া মাতা কহিলেন, "তোরা ত অনেক কেতাব পড়েছিস্, পুঁটীর একটা ভাল রকম নাম রাখ।"

এখন পুণ্ডরীক বি-এ পাশ করিয়াছিল বটে, এবং মেঘদূতের কিয়দংশ, আর শকুন্তলা পাঠ করিয়া সংস্কৃত কাব্যশাস্ত্রে বুৎপন্ন ছিল বটে, কিন্তু মহাকবি কালিদাসের উপরিউক্ত দুই গ্রন্থমধ্যে কোন স্থানে পুঁটীর নামকরণ হয় নাই। এবং মিল, ব্যেন প্রভৃতি সুবুদ্ধি দার্শনিকগণও এ সম্বন্ধে কুত্রাপি কোনও প্রকার উপদেশ প্রদান করেন নাই।

তথাপি মাতৃ-আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয় জানিয়া দুই দিন চিন্তার পর পুণ্ডরীক পুঁটীর জন্য একটি নাম সংগ্রহ করিল। এবং মাতাকে আসিয়া বলিল, "পুঁটীকে বারুণী-স্নান উপলক্ষে আমরা পেয়েছি এ জন্যে ওর নাম 'বারুণী' রাখলে মন্দ হয় না।"

মাতা কহিলেন, "বেশ, আজ থেকে ওকে আমরা 'বারুণী' বলে ডাকব।"

এইরূপে পুঁটি, বারুণী হইল। বারুণী নাম পাইয়া, এবং দিদিমার অপেক্ষা শতগুণ অধিক আদর লাভ করিয়া, অতি অল্পদিন মধ্যে বারুণী লাভপুর গ্রামটিকে এবং দিদিমাটিকে ভুলিয়া গেল। সেই সুলক্ষণাক্রান্ত এবং অত্যন্ত সুন্দরী বালিকাকে পুণ্ডরীকের কন্যাহীনা মাতা অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখিলেন। বাহিরের লোকও বালিকাটিকে যে দেখিত সেই তাহাকে একবার আদর করিয়া বলিত, "আহা যেন গড়ান লক্ষ্মী!"

এই লক্ষ্মী মেয়েটিকে সরস্বতী করিবার জন্য বি-এ, পাশ-করা

পুণ্ডরীক অধ্যাপনাভার গ্রহণ করিলেন। আদর ও যত্নের মধ্যে বারুণী ধীরে ধীরে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সুশীলার অভিমান।

একটি কারণে সুশীলার একটু অভিমান হইয়াছিল। হইবার কথা। পুটিকে যখন বারুণী নাম দেওয়া হইল, তখন পুণ্ডরীক এ সম্বন্ধে কোন পরামর্শ সুশীলার নিকট গ্রহণ করে নাই। পুণ্ডরীকের এ বড় অন্যায়। সে চিরদিন সুশীলার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিয়াছে। ঐ কুড়াইয়া পাওয়া মেয়েটার নামকরণ সুশীলার পরামর্শ অনুযায়ী হওয়া উচিত ছিল; তাহা হইল না কেন?

তা, লোকের অভিমান হয়; কিন্তু তাহা চিরদিন থাকে না। অভিমানের কারণ দূর হইলেই অভিমান চলিয়া যায়। কিন্তু বারুণীকে লইয়া বাড়ীর লোক বড় বাড়াবাড়ি করিয়াছিল। সুশীলার শ্বশুরের মাথায় পাকা চুল এমনই কি বেশী ছিল যে, তিনি প্রত্যহ দ্বিপ্রহরে বারুণীকে পাকা চুল তুলিতে বলিতেন? আর বারুণী আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে বলিয়া তাহার সহিত একত্রে ভোজন করা এবং সমুদয় মৎস্যপুচ্ছটি তাহাকে আহার করিতে দেওয়া শ্বশ্রূঠাকুরাণীর একবারে উচিত

হয় নাই। আর প্রত্যহ সকালে, সমস্ত কায নষ্ট করিয়া এবং নিজের শরীর নষ্ট করিয়া পুণ্ডরীক যে বারুণীকে পড়া বলিয়া দিত, এটাও তাহার তাহার পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্য হয় নাই।—কেন? তাহার লেখাপড়ার জন্য একটী পণ্ডিত রাখিয়া দিলেই ত চলিতে পারিত। আর পাড়ার লোক সকলে আসিয়া যে বার বার বারুণীর সম্মুখেই তাহাকে 'বড় লক্ষ্মী মেয়ে' বলিত, এটাও তাহাদের পক্ষে বড় অনুচিত কার্য্য হইত;—ছেলে মেয়ের কাছে কি তাহাদের সুখ্যাতি করিতে আছে?—তাহাতে ভাল মেয়েও খারাপ হইয়া যায়। আর ঝিরা যে বারুণীকে পাণ সাজিতে দিত এটাও ভারি অন্যায়। ছেলেমানুষ, কোন্ দিন পাণে এমন বেশী চূণ দিয়া ফেলিবে যে, লোকের জিভ্ একেবারে পুড়িয়া যাইবে—আর তাহার জন্য পুণ্ডরীক হয়ত সুশীলাকেই নিন্দা করিবে। বারুণীকে লইয়া এই সকল বাবাবাড়ী সুশীলার ভাল লাগিত না।

তাহার পর, সুশীলা মনকে প্রবোধ দিল যে, লোকের যদি বারুণীকে লইয়া এইরূপ বাড়াবাড়ি করাই ভাল লাগে, তবে তাহারা তাহাই করুক। কিন্তু সুশীলা পুত্রবতী হইলে, যে স্নেহ তাহার পুত্র বা কন্যা প্রাপ্ত হইত, তাহাদের প্রাপ্য সেই আদর সেই স্নেহ তাহারা জন্মাইবার পূর্ব্বেই একটা অজ্ঞাতকুলশীলা অপরিচিতা বালিকা আসিয়া যে নির্ব্বিবাদে উপভোগ করিবে, ইহাতে সুশীলার মনে একটু ক্ষোভ থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। কে সে, যে তাহার উপভুক্ত উচ্ছিষ্ট আদর এবং স্নেহ তাহার গর্ভজ বংশের তিলক আসিয়া উপভোগ করিবে?

কিন্তু সুশীলার এই বয়সেও ত তাহার কোলে বিধাতা একটি পুত্র দেন নাই। পুণ্ডরীকের মাতা কত দুঃখ করিতেন; কত দেবতার কাছে কত পূজা মানত করিতেন; কিন্তু বংশরক্ষার জন্য দেবতারা তাহার ক্রোড়ে একটি বংশের তিলক প্রদান করেন নাই, দেবতাদিগের এ বড় অন্যায়। সুশীলা দেবতাদিগের উপর চটিয়া গেল; বার বার তাঁহাদের দৃষ্টিহীনতার নিন্দা করিল।

সুশীল বার বার মনে করিত, যদি তাহার কোলে একটি ছেলে থাকিত, তাহা হইলে বারুণী এখন যে আদর পাইতেছে, সে আদর তাহার গর্ভজ সন্তানই প্রাপ্ত হইত। এস বৎসগণ এস; এক অদৃশ্য দেশ হইতে তোমাদের কোমল কমনীয়তা নিয়ে এস; আসিয়া সুশীলার শূন্য কোল আলো করিয়া বিরাজ কর।

কিন্তু এই নির্ম্মম বশংধরগণ সুশীলার সমস্ত আহ্বানই উপেক্ষা করিল। সুশীলার অন্ধকার ক্রোড়ে আলো করিয়া একটী সোণার চাঁদ ছেলেও উদিত হইল না। দেখিতে দেখিতে পাঁচ বৎসর চলিয়া গেল, তথাপি অভাগিনী সুশীলা মাতা হইতে পারিল না। হায় হায়! তাহার সন্তানের প্রাপ্য সমস্ত আদর সমস্ত স্নেহ পাঁচ বৎসর ধরিয়া বারুণী হেলায় উপভোগ করিয়া লইল। অভাগিনী অভিমানিনী সুশীলা ইহার কোন প্রতিকার করিতে পারিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বারুণীর বর মিলিল না।

বারুণী এখন একাদশবর্ষীয়া বালিকা। সে পুণ্ডরীকের যত্নে অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছে। পুণ্ডরীকের মাতার যত্নে অনেক গৃহকর্ম্মও শিক্ষা করিয়াছে। সুশীলার কার্য্য দেখিয়া সে সীবন বিদ্যাও কিছু লাভ করিয়াছে। এবং আমাদের ভরসা আছে, যে পুণ্ডরীকের পিতার যত্নে সে অবিলম্বে এক সৎপাত্রে সমর্পিতা হইবে; তিনি ঘটকদিগকে বলিয়া রাখিয়াছিলেন যে, কন্যাস্থানীয় বারুণীর বিবাহে তিনি বহু অর্থ ব্যয় করিবেন।

কিন্তু বারুণী সর্ব্বসুলক্ষণাক্রান্তা অপূর্ব্ব সুন্দরী হইলেও এবং তাহার পাণিগ্রহণে অর্থপ্রাপ্তির আশা থাকিলেও কোনও সৎপাত্রই অজ্ঞাতকুলশীলাকে বিবাহ করিতে সম্মত হইল না। সুতরাং বারুণীর জন্য একটি বর পাওয়া কঠিন হইয়া পড়িল। ঘটকসকল অর্থলোভে দুই তিন বৎসর অনুসন্ধান করিয়াও সফলমনোরথ হইতে পারিল না।

ক্রমে বারুণী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া তরুণী হইয়া দাঁড়াইল। তন্বীর তনু কৈশোরের কমনীয়তায় ঈষৎ পুষ্ট হইয়া উঠিল; কুসুম কাননে যেন বসন্তের সাড়া পড়িয়া গেল; ক্ষীণা স্রোতস্বতীতে যেন নূতন জলের প্রবাহ বহিল।

পুণ্ডরীক সে শোভা দেখিল। এ দেখায় ত কোনও দোষ হইতে পারে না। বাগানে ফুল ফুটিলে, কে না তাহা চাহিয়া দেখে? আকাশে পূর্ণচন্দ্র উঠিলে কে না তাহা নয়ন ভরিয়া নিরীক্ষণ করে?—মানুষের নয়ন চিরদিনই সৌন্দর্য্যপিপাসু থাকিবে। ইহা বিধাতৃবিধান। ইহাতে বেচারা পুণ্ডরীকের দোষ কি? অতএব দিনের পর দিন, সে তরুণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরাশি দেখিতে লাগিল, সুন্দরীর তনুতটে যৌবনের প্রথম তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখিয়া সে মুগ্ধ হইল, রূপের প্রথম তীব্র কিরণে তাহার চক্ষুর্দ্বয় অন্ধ হইয়া গেল। তাহার পর, তোমরা ত জান, সুন্দরীদের সৌন্দর্য্যে মাদকতা আছে; তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া পুণ্ডরীক উন্মত্ত হইয়া উঠিল।

তখন সুশীলার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া পুণ্ডরীক আপন উন্মত্ত মনকে শাসিত করিতে চেষ্টা করিল। এবং প্রতিজ্ঞা করিল, অবিলম্বে বারুণীর একটি বিবাহ দিয়া, তাহার তীব্র আকর্ষণের সীমার বাহিরে তাহাকে রাখিয়া আসিবে। এবং তৎপরে আপনার মুক্ত হৃদয় লইয়া সুশীলার বাহুশৃঙ্খলে বাঁধিয়া দিবে। হায়! পুণ্ডরীক! তুমি পাঁচ বৎসরের বারুণীর হস্ত হইতে একদিন আপনাকে মুক্ত করিতে সমর্থ হও নাই, আজ কিরূপে এই পঞ্চদশবর্ষীয়া প্রভাময়ীর প্রভাব হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে? দশটী বৎসর ধরিয়া বারুণী তোমার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে তোমার সমস্ত হৃদয়টিই অধিকার করিয়া লইয়াছে। আজ হৃদয়শূন্য তুমি, কোন শক্তি লইয়া, তোমার প্রমত্তহৃদয়কে শাসিত করিবে?

হয়ত সে চেষ্টা করিলে, কতকটা কৃতকার্য্য হইতে পারিত। কিন্তু পুণ্ডরীকের চেষ্টার পথে পুণ্ডরীকের মাতা এক মহা অন্তরায় হইয়া দাড়াইলেন। তিনি দুইটা কঠিন সমস্যার মধ্যে পতিত হইয়াছিলেন। একদিকে সুশীলার গর্ভে সন্তান না হওয়ায়, এবং তাহার সন্তান হইবার বয়ঃক্রম অতীত হওয়ায়, তাঁহার শ্বশুরকুল পাছে নির্ব্বংশ হয়, এই তাহার আশঙ্কা নিশিদিন পুণ্ডরীকের মাতার মনকে ব্যথিত করিয়া রাখিয়াছিল। অন্য দিকে পরম স্নেহের পাত্রী বারুণীর বিবাহের কাল অতীত হইতেছিল ; বহু চেষ্টাতেও একটি সুপাত্র পাওয়া কঠিন হইয়াছিল ; এই দুই সমস্যার মধ্যে পড়িয়া তিনি ভাবিলেন যে পুণ্ডরীক বারুণীকে বিবাহ করিলে, এই দুই সমস্যারই একটা মীমাংসা হইয়া যায়। তিনি পুণ্ডরীককে নিকটে ডাকিয়া আপন মনোভাব প্রকাশ করিলেন।

কিন্তু পুণ্ডরীক মাতার কথার কোন উত্তর দিল না। নিজেকে প্রাণপণ শক্তিতে—দমন করিয়া, বারুণীর জন্য সৎপাত্রের জন্য অনুসন্ধান করিতে লাগিল। একদিন মনকে দৃঢ় করিয়া পুণ্ডরীক পিতার নিকট আসিয়া বলিল, "আমি বারুণীর জন্যে একটি সৎপাত্রের সন্ধান পেয়েছি।"

পিতা। কোথায় সন্ধান পেলে ?

পুণ্ডরীক। এই ত পাড়ার হারাণ বাবুকে জানেন ত ?

পিতা। কি, হারাণ এই বয়সে আবার বিয়ে করবে না কি ? তার তিন চারটে ছেলে যে বড় বড় হয়েছে।

পুণ্ডরীক। না, হারাণ বাবু বিয়ে ক'রবেন না। হারাণ বাবুর এক সম্বন্ধী আছেন তিনি রামচন্দ্রপুরের জমীদার। তাঁর নাম——

পিতা। বুঝেছি, তুমি পার্ব্বতী ঘোষের কথা বল্‌ছ।

পুণ্ডরীক। আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনি ধনবান আর দেখতে শুনতে মন্দ ন'ন।

পিতা। কিন্তু তিনি সৎপাত্র ন'ন। আমি মদ্যপায়ী লোকের সঙ্গে বারুণীর বিয়ে দিতে পারিনে। আমি বেশ জানি যে পার্ব্বতী ঘোষ ঘোর মদ্যপায়ী।

তা, মদ্যপায়ীর হস্তে বারুণীর ন্যায় মহারত্ন সমর্পণ করিতে পুণ্ডরীকেরও ইচ্ছা ছিল না। সে পিতার নিকট হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অন্য একস্থানে ঘটক পাঠাইয়া দিল। কিন্তু সেটীও সুপাত্র হইল না;—বিদ্যাহীনের হস্তে রাজমুকুটের মণি সমর্পণ করিতে পারা যায় না। পুণ্ডরীকের আজ্ঞা পাইয়া ঘটক আবার একটি নূতন স্থান হইতে একটি পাত্রের অনুসন্ধান লইয়া আসিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও পাত্রটি পুণ্ডরীকের মনোমত হইল না; সেই নন্দনজান পারিজাতকে ধনহীন দরিদ্রের মলিন কুটীরে পাঠাইতে পারা যায় না। আবার একস্থল হইতে পাত্রের সংবাদ আসিল; কিন্তু পুণ্ডরীকের পিতা বলিলেন,—'ও বাহাত্তর ঘরের কায়েত। ওর সঙ্গে আমার কন্যাস্থানীয়ার বিয়ে দিলে লোকে কি বল্‌বে?' তাঁহাদের মত ভদ্রবংশোদ্ভব কুলীন কায়স্থের সহিত বাহাত্তর ঘরের কায়েতের কুটম্বিতা স্থাপন করা পুণ্ডরীকেরও অভিপ্রেত

হইল না। এই রূপে কোনও স্থানেই বারুণীর জন্য সৎপাত্র পাওয়া গেল না।

তবে কি স্বয়ং পুণ্ডরীক ব্যতীত আর কাহাকেও বিধাতা বারুণীর স্বামী হইবার জন্য সৃষ্টি করেন নাই? তবে কি পুণ্ডরীকই মাতৃআজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া বারুণীকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইবে? কিন্তু সুশীলার কি হইবে? পতিব্রতার মনে ব্যথা দিয়া বারুণীকে বিবাহ করিলে, সে বিবাহ কখনই মঙ্গলদায়ক হইবে না। তাহা অপেক্ষা বারুণীর অবিবাহিত অবস্থাতেই জীবন যাপন করা ভাল।

পুণ্ডরীক মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল যে, আপনার অশান্ত মনকে প্রাণপণ শক্তির দ্বারা দমন করিবে;—যে বুক সে বাল্যকাল হইতে আপনার আদর প্লাবিত বুকে ধারণ করিয়াছে, আজ কিরূপে সেই বুকে ব্যথা দিয়া পরম অধর্ম্ম করিবে? তাহা অপেক্ষা মৃত্যু কি তাহার পক্ষে মঙ্গলদায়ক নহে?

পুণ্ডরীক অনেক ভাবিয়াছিল। কিন্তু সে বারুণীকে ছাড়িয়া মরিতে পারে নাই; মরিলে যে সে বারুণীকে আর দেখিতে পাইবে না। আপনার হৃদয়কেও সে দমিত করিতে পারে নাই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রেমের কবিতা।

পোড়ারমুখী বারুণীও কি পুণ্ডরীককে ভালবাসে? বাসে বই কি,—খুবই বাসে। তাহার বিছানার তলায় যে খাতা খানা রহিয়াছে, তাহা গোপনে সংগ্রহ করিয়া, তাহার মধ্যে পোড়ারমুখী কি কবিতা লিখিয়াছে, তোমরা একবার পড়িয়া দেখ। দেখ কি গুরুতর প্রেম ;—

কারে বল ভালবাসি, কাহার হইব দাসী,
কাহার রূপতে, বল, শোভে দশদিক?
—পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক!
কাহার অধরে হাসি, দেখিবারে অভিলাষী
বল তোরা, কে আমার মাথার মাণিক?
পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক!
দিয়া কোন শতদল, পূজিব চরণ তল,
ভূতলে আমার সে যে অমর অধিক ;
পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক!
পাতিয়া রেখেছি হিয়া, তোমার চরণ দিয়া
আমার হৃদয় 'পরে এস হে প্রেমিক ;
পুণ্ডরীক, পুণ্ডরীক!

ধিক্ ধিক্! কি ভয়ঙ্কর কলিকালই পড়িয়াছে! সেকালে বাহাত্তর বৎসর বয়সেও প্রেমিকাদিগকে আমরা একটি ক্ষুদ্র প্রেমের কথা উচ্চারণ করিতে শুনি নাই; আর আজ কিনা একটা পঞ্চদশবর্ষীয়া নাবালিকা, আমাদের অপেক্ষা ভালরূপ ছন্দ বন্ধ মিলাইয়া প্রেমের কবিতা রচনা করিল!

বারুণীর হৃদয়মধ্যস্থিত এই গোপন প্রেমের কথা কি পুণ্ডরীক জানিতে পারিয়াছিল?—তামরসের বিকাশের কথা কি মধু মক্ষিকাকে বলিয়া দিতে হয়? তরুণীর ব্রীড়াবনত মুখ, সলজ্জ চাহনি, কথায় কথায় গণ্ডের অরুণ রাগ—সবই—দৈনিক সংবাদ পত্রের ন্যায়, দিনের পর দিন, তাহার হৃদয়ের সকল সংবাদই পুণ্ডরীকের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

একদিন নিভৃতে বারুণীর সহিত পুণ্ডরীকের সাক্ষাৎ ঘটিল। পূর্ব্বে পুণ্ডরীকের নিকট বসিয়া বারুণী যখন পাঠাভ্যাস করিত, তখন প্রায় প্রত্যহই তাহাদের নির্জ্জন সাক্ষাৎ ঘটিত। কিন্তু এক্ষণে বারুণী পাঠাভ্যাস জন্য আর পুণ্ডরীকের নিকট যাইত না; পুণ্ডরীকের নিকটে যাইবার জন্য তাহার লোলুপ হৃদয়ে সর্ব্বদাই এক লিপ্সা জাগিয়া থাকিত, কিন্তু তাহার লজ্জাসঙ্কুচিত চরণদ্বয় চলিতে চাহিত না—ছি? বড় লজ্জা করে। তাই ইদানিং পুণ্ডরীক নির্জ্জনে বারুণীর সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিত না। আজ তাহার সহিত হঠাৎ সাক্ষাৎ হওয়ায়, তাহার দু'টা মিষ্ট কথা শুনিবার প্রলোভন সে সম্বরণ করিতে পারিল না। সে জিজ্ঞাসা করিল, "বারুণী! এই ক'

মাসের মধ্যে তুমি ত একদিনও আমার কাছে পড়তে আসনি ?”

পুণ্ডরীকের দৃষ্টিতলে বারুণীর শিরায় রক্তপ্রবাহ ছুটিতেছিল। সে বাসনাকে সাধ্যমত সংযত করিয়া কহিল, “আমি আজ কাল দিদির কাছে বসে স্থচের কায শিখি।” বারুণী সুশীলাকে দিদি বলিত।

পুণ্ডরীক। স্থচের কাজ শিখলে কি আর লেখাপড়া করতে নেই ? লেখাপড়া ভুলে গেলে, তুমি যখন শ্বশুরবাড়ী যাবে, তখন কেমন করে আমাদের চিঠি লিখবে ?

বারুণী ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল, “শ্বশুরবাড়ী ?”

পুণ্ডরীক। হাঁ, শ্বশুরবাড়ী।—যেখানে বিয়ের পর সকল মেয়েই যায়। তোমার বিয়ের সম্বন্ধ আস্‌ছে ; বিয়ে হলেই তোমাকে শ্বশুরবাড়ী যেতে হ’বে।

বারুণী। কিন্তু আমি ত ঠিক করে রেখেছি বিয়ে করব না।

পুণ্ডরীক। কিন্তু আমরা যে তোমার বিয়ে দেব।

বারুণী। আমি বিয়ে না করলে, আপনারা কেমন করে আমার বিয়ে দেবেন ? আর কেমন করেই আমাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাবেন ?

পুণ্ডরীক। দেখো, কেমন করে পাঠাই।

বারুণী মনে মনে ভাবিল, “আমার পাঁচ বছর বয়সে, গঙ্গার পবিত্র জলে ভগবান আমাকে যাঁহার হাতে সমর্পণ করেছেন, পৃথিবীতে এমন কি শক্তি আছে, যে তাঁর কাছ থেকে আমাকে

ছাড়িয়ে নিয়ে যায়? আমি মনে মনে যাঁকে পতিত্বে বরণ করেছি, তিনি ছাড়া আর কেউ আমার স্বামী হবে না। তাঁর বাপের বাড়ী ছাড়া, আর কোথাও আমার শ্বশুরবাড়ী হবে না। কিন্তু প্রকাশ্য ভাবে বিয়ে করলে দিদির মনে ভয়ানক কষ্ট দেওয়া হবে। তাই আমি প্রকাশ্য ভাবে এঁকে বিয়ে করব না। কিন্তু আমার অন্তরের গোপন ভালবাসায় কে বাধা দেবে?

বারুণীকে নীরব ও চিন্তিত দেখিয়া পুণ্ডরীক আবার কি বলিতে যাইতেছিল; কিন্তু তাহার কথা অকথিত রহিল। সুশীলা সেই দিকে আসিতেছে দেখিয়া, সে চোরের ন্যায় আপনাকে লুক্কায়িত করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। সে মনে মনে বুঝিয়াছিল যে, বারুণীর প্রতি প্রেমের লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, সে সুশীলার নিকট হৃদয়হীনতার পরিচয় প্রদান করিয়া ফেলিবে! তাই তাহার লোলুপ দৃষ্টিটা সুশীলার পবিত্র দৃষ্টি হইতে গোপন করিবার জন্য প্রয়াস পাইত।

সেই দিন বহির্ব্বাটীতে যাইয়া আপন কক্ষের নির্জ্জনতায় বসিয়া পুণ্ডরীক ভাবিল, 'আচ্ছা, বারুণীর এই যৌবন, তবু সে বিয়ে করে শ্বশুরবাড়ী যেতে চায় না কেন? সে সত্যই কি আমাকে ভালবাসে, তাই বুঝি আমার কাছ ছেড়ে অন্য যায়গায় যেতে চায় না? বারুণী আমাকে ভালবাসে, আমি বারুণীকে ভালবাসি, আমার মা বাপও আমাদের হৃদয় দুটিকে পরিণয়সূত্রে বেঁধে দিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক। তবে আমরা মিলিত হতে পারিনা কেন? আমাদের উভয়ের মিলনের এক মাত্র বাধা সুশীলা,—সে

পতিপদসেবার মহা গৌরব মাথায় বোঝাই করে, একটা অলঙ্ঘনীয় পর্ব্বতের মত, আমাদের মধুর মিলনের মধ্যে বসে আছে। কিন্তু সুশীলা হিন্দু স্ত্রী; স্বামীর মনস্তুষ্টিই তার এক মাত্র ব্রত; আর সে ছেলেবেলা থেকে শিখে এসেছে, তার দিদিমাদের ঠাকুমা-দের চার পাঁচ টা সতীন ছিল; আজ সেই পতিব্রতা একটা সতীনে আপত্তি করবে? এটা সম্ভব নয়। হয়ত সে নিজে উদ্যোগ করে আমাদের বিয়ে দেবে।'

বাস্তবিক সুশীলা তাহাই করিয়াছিল; আপনার প্রাণ দিয়া সেই পতিগতপ্রাণা, পতির মনস্তুষ্টি করিয়াছিল। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদে সেই অপূর্ব্ব আত্ম বলিদানের কথা বিবৃত করিব।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সুশীলার আত্মবলিদান।

মহা রূপসী বারুণীর দিকে স্বামীর মন যে টলিয়াছে, তাহা সুশীলা অনেক দিন আগেই বুঝিয়াছিল। তাহার পর সে শুনিল যে তাহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী বারুণীর সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। শুনিয়া এরূপ অবস্থায় পড়িয়া অন্য হিন্দু যুবতীরা যাহা ভাবে, সুশীলা তাহাই ভাবিয়াছিল। সে রাত্রিদিন আপন মনকে শাসিত করিয়া মনে মনে বলিত, "আমার

মনে, হে ঠাকুর! বল দাও। আমার প্রাণেশ্বরের—আমার ইহকালের পরকালের দেবতার—সুখের জন্য, আমার স্বামীর বংশের কল্যাণের জন্য আমি আপনার সমস্ত সুখ বলি দেব। পাপ মন নিয়ে আমি এত দিন বারুণীকে সুচখে দেখিনি, আমার প্রাণের প্রাণ, আমার সর্ব্বস্ব যদি তাকে ভালবাসেন, তবে আজ থেকে আমিও তাকে ভালবাসব; নিজে তার অঙ্গে গহনা পরিয়ে তাকে আমার দেবতার চরণসেবায় নিযুক্ত করবো। আর আমি? ছাই আমি কীটাণুকীট আমি—আমার কথা যেন কখনও না ভাবি।"

নিশীথে শয্যোপরি স্বামীর পদপ্রান্তে ব'সিয়া সুশীলা মনে মনে কহিত, এই চরণ সেবা অন্যের হাতে ছেড়ে দিতে হ'বে; সে কি দুঃখ, তা অন্তর্যামী ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।' স্বামীর চরণ আপনার সুকোমল ক্রোড়ে স্থাপিত করিয়া তাহাতে আপন আনিন্দিত বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া সে আবার ভাবিত,—যদি এ দুর্লভ পায়ে অভাগিনীর মতি থাকে, তবে নিজে উদ্যোগ করে বারুণীর সঙ্গে এঁর বিয়ে দেব। এতে যদি প্রাণ দিতে হয়, তাও দেব; সুশীলা মরলে ত কারুর ক্ষেতি হবে না, ঠাকুর।"

সুশীলা ভাবিতে ভাবিতে কাঁদিয়া ফেলিত। পুণ্ডরীক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বারুণীর কথা ভাবিত; সে সুশীলার অশ্রু বর্ষণ দেখিত না। কিন্তু সুশীলার মৃত্যুতে তাহার কি ক্ষতি হইবে, সে তাহা পরে বুঝিতে পারিবে।

কয়েক দিন মধ্যে পুণ্ডরীক জানিতে পারিল যে বারুণীর

সহিত তাহার বিবাহে সুশীলাই প্রধান উদ্যোগী।—ইহা জানিতে পারিয়া পুণ্ডরীকের বক্ষটা দশহাত ফুলিয়া উঠিল;—একটা পর্ব্বতের বাধা যাদুকরের মন্ত্রে অপসৃত হইল।

ইদানীং সুশীলা স্বহস্তে বারুণীর কেশরচনা করিয়া দিত; সুশীলাকে দেখিয়া হয়ত সুশীলার স্বামী তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন; কিন্তু সুশীলার রচিত বারুণীর কেশ দেখিয়া তিনি নিশ্চয় তৃপ্তি লাভ করিবেন। বুঝি এই কথা ভাবিয়াই সুশীলা বারুণীর কেশরচনায় মন দিয়াছিল। একদিন বারুণীর কেশরচনা করিয়া, সুশীলা একখানি উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান করাইয়া তাহাকে সজ্জিত করিল। বিমল বস্ত্রাবৃত তাহার বরদেহ মণ্ডলমণ্ডিত চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সুশীলা আপন বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা বারুণীর ললাটতল মার্জ্জিত করিয়া, ভ্রূমধ্যে কৃষ্ণ টিপ্ অঙ্কিত করিল;—অনঙ্গদেব তপস্যার জন্য আপনার অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণাজিনের আসনখানি তথায় বিস্তৃত করিলেন। বারুণীর দামিনী দীপ্তিতুল্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া, সুশীলা ভাবিল, 'স্বামীর চরণতল, এই দিয়েই সাজাতে হয়।' সে প্রকাশ্যে কহিল, 'আয়, বারুণি আমার সঙ্গে আয়! আমার বরকে প্রণাম করবি চল।'

লজ্জা সঙ্কোচে আপনাকে সম্পূর্ণ সঙ্কুচিত করিয়া বারুণী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুশীলা কহিল, "লজ্জা কি বোন? দুদিন পরে উনি ত তোরও বর হবেন। ঐ দেখ উনি উপরের বারান্দায় বসে আমাদের দেখছেন।"

বারুণী ব্রীড়াবিকুপিত নয়নে বারান্দার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, পুণ্ডরীক বারান্দায় বসিয়া একখানা খাতা পড়িতেছে। খাতাখানা কিসের? বারুণী সভয়ে বুঝিল, সর্ব্বনাশ! উহা যে সেই কবিতা লেখা তাহারই খাতা। উহা উহঁার হস্তে গেল কিরূপে!

সুশীলা কহিল, 'খাতাখানা আমি তোর বিছানার তলায় পেয়ে ওঁকে পড়তে দিয়েছি। তুই কেমন ভাল কবিতা লিখিতে পারিস, তা উনি একবার পড়ে দেখুন।'

লজ্জায় বারুণীর সুন্দর মুখখানা রক্তচন্দনচর্চ্চিত প্রসূনের ন্যায় শোভা পাইল। দেবী জানকীকে মেদিনীদেবী যে প্রকার আপনার নিভৃত ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া লুক্কায়িত করিয়াছিলেন, আজ যদি তিনি বারুণীকে তেমনই লুকাইতে পারিতেন, তাহা হইলে সে এই ভয়ঙ্কর লজ্জা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিত।

সুশীলা তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "লজ্জা কি, বোন? আয় আমার সঙ্গে আয়, যাঁকে এতদিন মনে মনে পূজা করেছিস, আয় আজ আমার সুমুখে তাঁর পায়ে প্রণাম কর। দেখে আমার জন্ম সার্থক হোক।"

কাষ্ঠপুত্তলিকার মত, স্বপ্নাভিভূতার মত সুশীলাকে অনুসরণ করিয়া বারুণী পুণ্ডরীকের পদে প্রণতা হইল। পুণ্ডরীক ধন্য হইল।

কি উৎকৃষ্ট কুসুমের দ্বারা সুশীলা স্বামীর চরণ পূজা করিয়া তাহাকে তৃপ্ত করিল? কিন্তু মানবচক্ষের অগোচরে, সে ইহা অপেক্ষা আরও এক দেবদুর্ল্লভ দ্রব্যের দ্বারা স্বামীর চরণ অলঙ্কৃত

করিয়াছিল,—দেবী আপনার রক্তকমল সদৃশ রক্তাক্ত হৃদয়টি চিরবাঞ্ছিতের চিরপ্রিয়তমের চরণতলে উপহার প্রদান করিয়াছিল।

* * * *

পিতা মাতা শুভদিন নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। সুশীলার অনুরোধে ও যত্নে, বেশ একটু ধুমধামেই পুণ্ডরীকের সহিত বারুণীর বিবাহ হইয়া গেল।

ফুলশয্যার রাত্রে যখন পুষ্পাকীর্ণ শয্যায় পুষ্পময়ী বারুণীকে বক্ষে ধারণ করিয়া পাপিষ্ঠ পুণ্ডরীক অত্যন্ত সুখে স্বর্গের স্বপ্ন দেখিতেছিল, তখন গৃহদ্বারে একটা কোলাহল শুনিয়া তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তথায় এক পরিচারিকা আসিয়া ভয়বিকৃত কণ্ঠে ডাকিতেছিল, 'দাদা বাবু, দাদা বাবু, শীগ্‌গির একবার বৌদির ঘরে এস। বৌদি কি রকম করছে।"

পুণ্ডরীক নগ্নপদে ছুটিয়া সুশীলার গৃহে প্রবেশ করিল; দেখিল, সুশীলা, শীরাহতা পক্ষিণীর ন্যায় শয্যায় উপর পড়িয়া যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। সে মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করিয়া তীব্র হলাহল পান করিয়াছিল। পুণ্ডরীক কাতর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "সুশীলা কেন তুমি এমন কায করলে?"

সুশীলা একথার কি উত্তর দিবে? যে রমণী অন্যের হস্তে আপন হৃদয়নিধিকে সমর্পণ করিতে পারে, তাহার হৃদয়ব্যথা পুরুষ পুণ্ডরীক কি বুঝিবে? সে তাহার সুগঠিত বাহু প্রসারিত করিয়া আপনার দুই হস্তের দ্বারা স্বামীর পদদ্বয় গ্রহণ করিয়া কাহল, "তুমি দাসীকে ক্ষমা কর। আশীর্ব্বাদ কর, যে জন্ম জন্মান্তর যেন

দাসী তোমার চরণ সেবা করতে পারে। এ পৃথিবীতে আমার কায ফুরিয়েছে। যে কাযের জন্যে দাসী এত দিন বেঁচে ছিল, তা বারুণীর হাতে দিয়ে, আমি তোমার কাছে এ জন্মের মত বিদায় চাচ্ছি।”

বলিতে বলিতে সুশীলার মুখ ম্লান হইল। কণ্ঠস্বর বিকৃতি-প্রাপ্ত হইল। সে স্বামীর পদদ্বয় ত্যাগ করিয়া সেই পদস্পর্শপূত হস্তদ্বয় আপন মস্তকে স্থাপিত করিল।

পুণ্ডরীক গণ্ডপ্রবাহিত অশ্রুধারায় সুশীলার সর্ব্বাঙ্গ বিধৌত করিয়া দিল। কাঁদ পুণ্ডরীক, কাঁদ। যাহারা আপন অশান্ত চিত্তকে দমিত করিতে পারে না, বিধাতা তাহাদের ভাগে ক্রন্দন ছাড়া আর কিছু লেখেন নাই।

সুশীলার মৃত্যুর পর পুণ্ডরীক বারুণীর সেবার সহস্র বিধানেও জীবনে আর কখনও সুখ অনুভব করিতে পারে নাই। তাহার সমস্ত সুখের মধ্যে কোথা হইতে এক ম্লান মূর্ত্তি আসিয়া তাহার আনন্দের সব ছবি ম্লান করিয়া দিত। সুশীলাকে গ্রাস করিবার জন্য শ্মশানে একদিন যে অগ্নি জ্বলিয়াছিল, পুণ্ডরীকের দগ্ধ হৃদয়ে, তাহার উত্তাপ কখন শীতলতা প্রাপ্ত হয় নাই।

সমাপ্ত